Chodaidihor Shalukful by Buddhadeb Guha

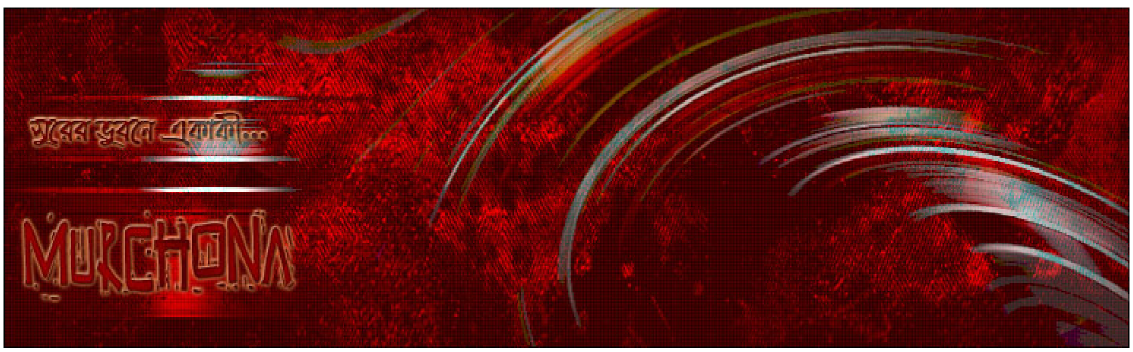

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

চড়াইডিহির শালুকফুল
বুদ্ধদেব গুহ

উপন্যাস

চড়াইডিহর শালুকফুল

বুদ্ধদেব গুহ

বড়মামিমা বললেন, একটু পরেই সন্ধে হয় যাবে। কোথায় বেরুচ্ছিস তপু এখন ?

'হলুদ বাড়িতে' যাব বড়মামি। হনসোদিদি বলছিল, জোজোমামারা এসেছেন নাকি গত রাতেই। পুজো কাটিয়ে যাবেন। লক্ষ্মীপুজোও কাটাবেন এখানেই।

-- হ্যাঁ। ওদের আসার কথা ঘেটোও আমাকে বলেছিল বটে। ঘেটোর ছোট ভাই নেটো তোদের বাড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট মালি। আর হেড মালি বসন্ত নাকি স্টেশনে গেছিল কাল বিকেলে জোজোদের আনতে। কিন্তু ট্রেনে করে আসেইনি। জোজোর স্করপিও গাড়িতে করেই এসেছে সোজা কলকাতা থেকে। বহুদিন পরে এল ওঁরা। তবে 'ওঁরা' বলতে তো শুধু দুজন।

দুজন কেন ?

জোজোর স্ত্রী কেটি তো তিনবছর আগেই চলে গেছে। ও হাইলি ডায়েবেটিক ছিল।

হার্ট অ্যাটাকে গেলেন ? ঘুমের মধ্যেই ? তাহলে তো কোনও কষ্ট পাননি। শুনি ডায়াবেটিকরা হার্ট অ্যাটাক হলে কষ্ট বুঝতে পারেন না।

-- না না, হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়নি কেটি। দু বছর রেগুলার ডাইলিসিস চলছিল। কিডনির প্রবলেম ছিল। তাতেই ...

জোজোর ছোট মেয়ে পুপু। বড় ছেলে আর বড় মেয়ে তো স্টেটস-এই পড়াশোনা করে তারপর সেখানেই সেটল করেছে। একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। একজন আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে, অন্য জন ইতালিয়ান ছেলে। কাজের সময়েও আসার সময় পায়নি। একজন হলিডেতে গেছিল বাহামাতে অন্য জনের অফিসে সাংঘাতিক জরুরি কাজ ছিল। একটা প্রেজেন্টেশন -- ফরেন ক্লায়ান্ট ওর সামনে। শাশুড়িও অসুস্থ ছিলেন।

তাই ?

মনে হল, বড়মামিমার গলাতে একটু শ্লেষ ঝরল। তারপর বললেন, তা এই

জঙ্গুলে জায়গাতে রাতের বেলা যাওয়ার কী দরকার ? কাল সকালে গেলেই তো পারতিস ? এসেছিস তো মোটে গতকাল। তা ছাড়া তুই তো আর এখানে থাকিস না। কাঁচা রাস্তাতে কোথায় খানা কোথায় খন্দ তা কি জানিস ? আসছিসও তো পাঁচ বছর পরে।

টর্চ নিয়ে তো যাব। তাছাড়া, আজ তো চতুর্থী। শুক্লপক্ষর চাঁদ তো উঠবে তাড়াতাড়িই। বম্বে-কলকাতাতে থেকে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই তো প্রায় ছিন্ন হতে বসেছে। তবে বম্বে-হাইতে থাকায় সমুদ্রর সঙ্গে ভাব হয়েছে বেশ। তাই তো মা-বাবার সঙ্গে কুয়ালালামপুরে না গিয়ে তোমার কাছে চলে এলাম। আর দুদিন বাদেই তো ষষ্ঠী। অথচ হৈ-হট্টগোল নেই, পুজোর প্যান্ডেলে ফুটপাথ ঘেরা নেই। গড়িয়াহাট কি শ্যামবাজার দিয়ে তো বছরের এই সময়ে হাঁটারই উপায় নেই। তোমাদের এখানকার সেই চিড়িয়াটোংড়ির পুজোটা হয় তো এখনও ?

হয়। সেখানেই তো অষ্টমীর দিনে অঞ্জলি দিই।

শুধুই অষ্টমীর দিন কেন ?

হাঁটু। হাঁটুর জন্যে। এখন তো আর গাড়ি নেই।

গাড়ি তো তুমি ইচ্ছে করে ফটককে দান করে দিলে।

ও ছেলেমানুষ, খুব বেড়াতে ভালবাসে। বেরিয়ে এসে আমাকে গল্প করে। এখানে গাড়ির দরকারই বা কি ? গরুর গাড়িতেই তো দিব্যি কাজ চলে যায়। বুঝলি তপু, প্রয়োজন বাড়ালেই বাড়ে। চারদিকে অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের ভারে চাপা পড়ে থাকা এত লোক দেখি যে প্রয়োজন আর বাড়াব না।

তারপরে বললেন, তুই একটা পাগল তপু। কুয়ালালামপুরে না গিয়ে কেউ জঙ্গলের মধ্যের ঝাড়খন্ড আর ওড়িশার সীমান্তের এই অখ্যাত চড়াইডিহরে পুজোর ছুটি কাটাতে আসে।

জায়গার খ্যাতি-অখ্যাতি দিয়ে কী করব আমি। জায়গাটা ভারী ভাল লাগে আমার। শান্ত, নির্জন, জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা। বড়মামা চলে যাওয়ার পরে কলকাতাতে না থেকে তুমি যে এখানেই থাকা মনস্থ করেছ তাতে তোমার আয়ু বেড়ে যাবে।

এখানে তো কোনও টেনশন নেই, আওয়াজ নেই, ধুলো-ধুঁয়ো নেই। তবে জীবনের কোনও উদ্দেশ্যে না থাকলে বাড়তি আয়ু একটা বোঝা। ক্ষমতা থাকলে আমার আয়ু আমি তোকে দিয়ে যেতাম।

একটু চুপ করে থেকে তপু বলল, এর আগে মাত্র একবারই তো এসেছিলাম। তাও পুরো পাঁচ বছর হয়ে গেছে। এম এস সি পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলাম। জানো বড়মামিমা, এখনও যেন চড়াইডিহর ঘোর লেগে আছে চোখে।

বড়মামিমা মৃন্ময়ী বললেন, পাঁচ বছর অনেকই সময়। পাঁচ বছরে যে কোনও জায়গা বা মানুষ অনেকই বদলে যায়। এতটাই বদলে যায় যে, চেনা পর্যন্ত যায় না।

সেবারেও জোজোমামারা এসেছিলেন। তবে তাঁদের ছোট মেয়ে, কী যেন নাম বললে, পুপু না কী, সে আসেনি। ওঁরা দুজনেই শুধু এসেছিলেন।

পুপু আসবে কী করে তখন। ও তো দিল্লির কোনও নামী রেসিডেনসিয়াল স্কুলে পড়ত। স্কুলটার নাম ভুলে গেছি। তখন ওর ছুটি ছিল না। তাছাড়া, শুনেছিলাম, সামনেই ওর স্কুল-লিভিংয়ের পরীক্ষাও ছিল।

ও।

তপু বলল।

তারপর বলল, যাই। ঘুরে আসি।

যদি যাসই তবে আর দেরি করিস না। আর জোজোকে বলিস আমার এখানে যেন তাড়াতাড়ি আসে দু-একদিনের মধ্যেই। গত পাঁচ বছর অবশ্য প্রতি বছরই

বিজয়ার চিঠি লিখেছিল জোজো একটা করে।

বলো কি মামিমা? এই মোবাইল ই-মেইল-এর দিনে বিজয়ার চিঠি! আনথিংকেবল।

তা ঠিক। তবে জোজো লিখেছিল। গিরিডিতে যখন ওর বাবা এবং আমার বাবাও থাকতেন তখন আমাদের উপরে ব্রাহ্মপ্রভাব খুব বেশি করেই পড়েছিল। যদিও আমরা বা ওরা কেউই ব্রাহ্ম ছিলাম না। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক চিন্তা-ভাবনাতে পশ্চিমি-ভাবাপন্ন, তাঁরাই তো তখনকার দিনে ব্রাহ্ম হতেন বেশি। ব্রাহ্ম মাত্রই কিন্তু বাঙালিয়ানাতেও বিশ্বাস করতেন। ইংরেজি জানার সঙ্গে যে বাঙালিয়ানার কোনও ঝগড়া নেই তা ওঁদের দেখে বোঝা যেত। আমরাও ওঁদেরই মতো ছিলাম।

সত্যি! আজকাল ইংরেজি-জানা ছেলেমেয়েরা বাঙালিয়ানাকে একেবারেই বর্জন করেছে। এটা এক ধরনের অশিক্ষা, এক ধরনের গভীর হীনম্মন্যতা বলেই মনে হয় আমার।

-- তুই তোরই মতো। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেমেয়েই অন্যরকম। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যেন অন্য গ্রহের জীব। এদের যেন আমরা চিনিই না। ওরাও চেনে না আমাদের।

তুমি যাবে না ওঁদের ওখানে? যাবে তো চলো আমার সঙ্গে।

আমি তো হাঁটুর ব্যথাতে কোথাও যেতে পারি না। আজকাল গেলে, লাঠি লাগে। আর লাঠি নেওয়ার মতো বুড়ি তো আমি এখনও হইনি। লাঠি ঠকঠক করে তাই কোথাওই যেতে ইচ্ছে করে না। জোজোকে বলিস আমার কথা।

ঠিক আছে, বলব।

তারপর তপু বলল, এতদিন পরে জোজোমামা আমাকে চিনতে পারবেন তো ?

অবশ্যই পারবে। আজকে জোজো মস্ত বড় লোক হয়েছে কিন্তু তার যৌবনে তোর বাবার কাছে থেকে যে সাহায্য সে পেয়েছে তা না পেলে সে ভেসে যেত।

তারপরই বললেন, জোজো বড়লোক হলেও অন্য অনেক বড়লোকের মতো অমানুষ নয়। বরং কেটিরই একটু দেমাক ছিল। তবে আমার কাছে আর কী দেমাক দেখাবে ! ঈশ্বরের দয়াতে আর তোর বড়মামার দূরদৃষ্টিতে আমি তো কারও দেমাকের পরোয়া করিনি কোনওদিন। আজও করি না। আমার কাছে দেমাক দেখায় না তবে অন্য অনেকের কাছে শুনেছি, বিশেষ করে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, যে তাদের কাছে দেখাত। যাক গে যাক, চলে যাওয়া মানুষের নিন্দে করতে নেই।

তপু মনে মনে একটু বিরক্ত হল। মেয়েরা যতই উচ্চশিক্ষিত ও উদার হন না কেন মনে হয়, কিছু মেয়েলিপনা তাঁদের মধ্যে থেকেই যায়। এটা ওঁদের মুখের উপরে বলা যায় না বটে কিন্তু তপু তার বড় মামিমারই মতো একাধিক মহিলার মধ্যেই এই মেয়েলিপনা দেখেছে। তবে এটা শুধু মেয়েদের মধ্যেই নয়, অনেক পুরুষের মধ্যেও লক্ষকরেছে। তাঁরা হয়তো ঠিক পুরুষ নন, তাঁদের বলা যায় মেয়েলি-পুরুষ।

স্থানীয় মানুষদের মুখে মুখে জোজোমামার বাড়ির নাম যদিও ‘হলুদ বাড়ি’ আসলে মালিকের দেওয়া নামটি ‘দ্য রিট্রিট’।

বাঙালিরা একসময় যেখানেই বাইরে বাড়ি করতেন, তাঁদের অনেক বাড়ির নামই রাখা হত ‘দ্য রিট্রিট’। সাহেবি কায়দাতে। সে বাড়ি গিরিডি, মধুপুর, শিমুলতলা, ঘাটশিলা বা হাজারিবাগ যেখানেই হোক না কেন। নাম ‘দ্য রিট্রিট’ হলেও শুধু চড়াইডিহর নয়, আশেপাশের সব গ্রামের মানুষই এই বাড়িকে ‘হলুদ বাড়ি’ বলেই চেনে। সে বাড়ির বাইরের রঙই যে হলুদ তাই-ই নয়, তার দরজা-জানলা সব কিছুর রঙই হলুদ। পাঁচ বছর আগে তাই দেখেছে অন্তত। সব ঘরের জানলার পেলমেট থেকে হলুদ-রঙা পর্দা ঝোলে। বাগানে যে আধলা ইট দিয়ে কেয়ারি করা আছে তাতেও সাদা নয় হলুদ রং। এই তল্লাটে একমাত্র এ বাড়িতেই জেনারেটর আছে। লোডশেডিংএর সময়ে আলো তীব্রতর হয়ে জ্বলে। এ বাড়ির শোবার ঘরে এয়ার-কন্ডিশনারও আছে। জোজোমামা আরামি। সেন সাহেব নাকি আগে আরও আরামি ছিলেন, লোকে বলে।

বড়মামির বাড়ি থেকে সিকিমাইল মতো পথ। লালমাটির পথ। দুপাশে গাছগাছালি ঝুপড়ি হয়ে আছে। শরৎকালে গাছেদের গা থেকে এক আশ্চর্য মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। কারও বাড়ির হাতাতে শিউলি গাছে শিউলি ফুটেছে অজস্র। সারা রাত টুপ-টাপ করে ফুল ঝরিয়ে সকালে কমলা আর সাদা রঙা গালচে বিছিয়ে দেয় প্রকৃতি। মাথার উপর দিয়ে ঝুপ-ঝুপ আওয়াজ করে নতুন অন্ধকারে দুটি বাদুড় উড়ে গেল। শিশির পড়া শুরু হয়েছে কিন্তু বোঝা যায় না। নিঃশব্দে পড়ে। গাছের পাতায়, পথের ঘাসে, পাতাগুলো সব ভিজে গেলে তা থেকে টুপটুপ করে বৃষ্টির মতো পড়তে থাকবে। শিশিরেরও ভারি মিষ্টি গন্ধ আছে একটা, যা তার নিজস্ব। আকাশ তারা ভরা। তারা ছাড়াও মানুষের তৈরি নানা উপগ্রহও তারারই মতো উজ্জ্বল হয়ে আকাশে ঘোরে। সেই সব উপগ্রহ নানা স্বাভাবিক গ্রহ-নক্ষত্রর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীকে। এবং পৃথিবীর অনেক কাছেও থাকে।

শুক্লা চতুর্থীর হালকা চাল-ধোওয়া জলের মতো জ্যোৎস্নাতে ভেসে যাচ্ছে চড়াইডিহর। একটু দূরেই পাহাড়। পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভাল। তাতে আদিবাসীদের একটি ছোট গ্রাম আছে। কী আদিবাসী তা জানে না তপু। জানা উচিত ছিল। শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে তফাৎ রচনা করে ঔৎসুক্যই। যার ঔৎসুক্য নেই, সে অশিক্ষিত। তবে তীব্র ঔৎসুক্য থাকা মানুষও যখন বুড়ো হন তখন তাঁর সেই ঔৎসুক্য স্তিমিত হয়ে আসে অধিকাংশর বেলাতেই। ঔৎসুক্য যাঁর মরে গেছে, ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর যৌবনও অপগত হয়েছে।

দূর থেকে 'হলুদ বাড়ির' গেটটা দেখা যাচ্ছে। গেটের দু পাশের পিলারের উপরে দুটি গোল হলুদ ডোম-এর আলো জ্বলছে। তপুর মনে আছে পাঁচ বছর আগেও ওই আলো দুটিকে দেখেছিল। তবে গেটের ওই আলো তখনই জ্বলে যখন ওঁরা চড়াইডিহরে থাকেন। অন্য সময়ে বাগান ও বাংলোর হাতা পেরিয়ে গিয়ে বাইরের চওড়া বারান্দাতে একটি মাত্র আলো জ্বলে। পেছনে ও দু পাশেও জ্বলে সারারাত। শুনেছিল গত বারে।

'হলুদ বাড়িতে' একজন কেয়ারটেকার এবং দুজন মালী থাকে। তাদের কোয়ার্টার বাগানের দুদিকে। কেয়ারটেকারের নাম ভুলে গেছে তপু কিন্তু এটা মনে আছে যে সেই বাঙালি ভদ্রলোক সম্ভবত ক্লাস এইট-নাইন অবধি পড়েছেন। ইংরেজি ও বাংলা লিখতে পড়তে পারেন। জোজোমামাদের অনুপস্থিতিতে উনিই বাড়ির ও বাগানের দেখভাল করেন। ফলসার সময়ে ফলসা, আমলকির সময়ে আমলকি, আমের সময়ে আম ঝুড়ি করে কলকাতাতে নিয়ে যান। হয় অনেক রকমেরই ফল, কিন্তু বাগান ইজারা দেওয়া আছে। ওঁদের মস্ত বড় বাগান। প্রায় পনেরো বিঘা মতো। বড়ামামির বাড়ির হাতাও প্রায় কুড়ি বিঘার মতো। ইজারাদাররাই ফল নিয়ে যায়। সে বাবদে যে টাকা আদায় হয় তাতেই কেয়ারটেকার ও মালীদের মাইনে উঠে আসে। কিছু হয়তো ঘাটতি পড়ে। সে টাকা প্রতি মাসে জোজোমামা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিতেন আগে। বড়মামিমা বলছিলেন, বছর দুই হল জোজোমামা বড়মামিমার কাছেই থোক টাকা দিয়ে যান। বড়মামিমা একা থাকেন তার উপরে জঙ্গুলে জায়গা, তাই রাখতে নিমরাজি ছিলেন, বলেছিলেন, তোমার ওই টাকার জন্যেই আমার বাড়িতে ডাকাতি হবে কোনওদিন -- আমাকে কেটে রেখে যাবে।

জোজোমামা নাকি বলেছিলেন, হারীতদা এই চিড়িয়াডিহর মানুষদের জন্যে যা করেছেন তারপরে যদি তারা তোমার সঙ্গে এমন বেইমানি করে তবে মনুষ্যত্ব বলে আর কি থাকবে ? পুকুর কেটে দেওয়া, রাস্তা বানিয়ে দেওয়া, কুঁয়ো খুঁড়ে দেওয়া, স্কুল ও হেল্থ সেন্টার বানিয়ে দেওয়া কি না করেছেন হারীতদা এদের জন্যে ? যে ট্রাস্ট বানিয়ে গেছেন তার আয় থেকেই তো এসবের খরচ এখনও চলে। এখানকার কোন মানুষে তা না জানে !

বড়মামিমা বলেছিলেন, সবই ঠিক বলছ জোজো কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব কি আছে আর ? লেখাপড়া জানা শহরে মানুষেরাই অমানুষ হয়ে গেল তো এই অশিক্ষিত গ্রামীন মানুষদের দোষ দিয়ে লাভ কি ? তাছাড়া তোমার হারীতদার এই বদান্যতা নানা পার্টি ভাল চোখে দেখে না। এতে যে তাদের মোড়লি করার অসুবিধা হয়। কৃতিত্ব সব হারীতদার নামে জমা হয়। কোনও পার্টিই তো মানুষের ভাল চায় না, তাদেরই
ভাল চায়, নিজেদের বাক্সে ভোট চায়।

তা অবশ্য ঠিক। তবে তোমার উপরে হামলা করার সাহস কারোই হবে না। তারপরে জোজোমামা নাকি বলেছিলেন, এরা তেমন শিক্ষিত নয় বলেই এখনও মানুষ আছে বৌদি। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার জীবদ্দশাতে এরা কখনও

তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করবে না।

বড়মামিমা বলেছিলেন, জানি না। নিজের পেটের ছেলেমেয়েরাই যদি অবহেলে ত্যাগ করতে পারে তা হলে এদের দোষ দেব কী করে।

ত্যাগ আর কোথায় করল। ওরা বিদেশে কাজের মধ্যে থাকে। পনেরো দিনের ছুটি পায় মোটে -- কোথাও হলিডেতে যায়। পশ্চিমী দেশের জীবন তো আমাদের দেশের মতো ঢিলেঢালা নয়। কাজই ওদের কাছে সব।

বড়মামিমা বলেছিলেন, জানি না। জোজো। ওদের কথা ওরাই জানে। আমার মরার সময়ে মুখে জল এই শালুকফুল আর হনসোরাই দেবে। জানি না, এই শ্মশান জাগিয়ে একা একা আর কতদিন বেঁচে থাকব। তোরা অল্পদিনের মধ্যে আসিস তাই তোদের এত ভাল লাগে। আমার মতো যারা সারা বছর থাকে তাদের একঘেয়ে লাগে। যদি কেউ সুইজারল্যান্ডে থাকে তারও হয়তো তাইই লাগে।

ছেলেমেয়ের কাছে মাঝে মাঝে গেলেই পারেন।

গেছি তো তিন-চারবার। ও দেশের জীবনযাত্রা আমার ভাল লাগে না। বড় পরাধীন লাগে।

সাত সকালে নানান পাখির কিচিরমিচিরের মধ্যে ঘুম ভাঙল তপুর। গত রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত হয়েছিল। একটা বই পড়তে পড়তেই রাত হয়ে গেছিল। খাওয়ার টেবিলে বসেও নানা গল্প করতে করতে এবং বড়মামিমার গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়েছিল। বড়মামিমা বেশ অভিমানী হয়ে উঠেছেন। আমি যদি না আসতাম তাহলে বড়মামিমা পুজোর মধ্যে একলাই থাকতেন। অবশ্য জোজোমামারা এসেছেন। তবে তিনিও তো একাই -- মানে বিপত্নীক। একজন ভারতীয় মহিলা অন্যজনের সঙ্গে যে সব গল্প করতে পারেন তা একজন পুরুষের সঙ্গে পারেন না, আজও পারেন না। তপু এসে মামিমার সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। তবে এবারে চড়াইডিহিতে এসে দেখছে যে হনসো আর শালুকফুলই এখন বড়মামিমার সঙ্গী এবং সাথী। হনসোকে গতবারে এসেও দেখেছিল। হনসোর বয়স পঞ্চাশের প্রথম দিকে। তার স্বামী আছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে সেরাইকেলাতে কী একটা কাজ করে। স্বামী মাইল তিনেক দূরের গ্রামে চাষবাস নিয়ে থাকে। সেখানে বড়মামিমারও চাষের জমি আছে। হনসোর স্বামী সপ্তাহান্তে চড়াইডিহতে এসে হনসোর কোয়ার্টারে থাকে বড়মামিমার অতিথি হিসেবে। ওদের এক মেয়ে। বিয়ে হয়ে টাটার কাছের আদিত্যপুরে চলে গেছে। জামাই সেখানেই কারখানাতে কাজ করে। বড়মামি বা তাঁর অতিথিদের গরুর গাড়ির দরকার হলে

বুক অবধি টানা হলুদ আর লাল চেক চেক কম্বলটার গায়ে পুবের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। রোদ পড়েছে তপুর পায়ের উপর। একটা দুর্গা টুনটুনি ডাকছে জবা গাছের ডালে বসে। অন্যদিকের রঙ্গনের ঝোপে দুটি সিপাহী বুলবুল রঙ্গনের ঝোপের গায়ের শিশির ঝরিয়ে লড়াই করছে। ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা গাছটা শিশিরস্নাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানলার পাশে। সারা রাত শিশির পড়েছে। এই ঘরটা বড়মামির ছেলে রাহুলদার ঘর ছিল। সকালের রোদ শিশিরভেজা গাছপালার পাতার উপরে পড়ায় পুরো এলাকাটা পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স-এর বড়বাবু জওহরলাল চন্দ্রর চেম্বার হয়ে গেছে যেন। হাজার হাজার হিরে ঝিকমিক করছে চারধারে।

শালুকফুল তপুর গায়ের পাশের জানলার গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাদা দু-সারি সুচারু দাঁতে হাসি চমকিয়ে বলল, চা আনব তপুদাদা?

শালুকফুলকে দেখতে শালুকফুলেরই মতো। শালুকফুল বড়মামিমার কাছেই থাকে। বয়স হবে উনিশ-কুড়ি। এই আদিবাসী তরুণীর মধ্যে সৌন্দর্য তো আছেই কিন্তু তার চেয়েও বেশি যা আছে তা অপাপবিদ্ধতা-অকলুষিতা-অনাঘ্রাতা ভাব -- যেন সত্যিই শালুকফুলটি। তাছাড়া আছে অনাবিল প্রাণবন্ততা। চলকে চলকে হাঁটে, ছলকে ছলকে কথা বলে।

তপু ওর মুখের দিকে মোহাবিষ্টর মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আনো।

বলেই, কম্বল সরিয়ে উঠে ঘরের দরজার খিল খুলে দিল। খুলে দিয়ে, আবারও গিয়ে শুয়ে পড়ল।

গতকাল সে বাড়িতে ছিল না। কোথায় গেছিল তা তপু জানে না। তবে সে ফিরেছিল। ফিরেই বড়মামিমার ঘরে কী কাজে যেন ব্যস্ত ছিল। ভাল করে দেখেনি তপু।

বড়মামির ছোট্ট পুকুরে বড় বড় রাজহাঁস সাঁতার কাটছিল। তারা বড় উচ্চস্বরে ডাকে। তাদের পাহারাদার হিসাবে রেখেছেন বড়মামিমা কিন্তু শেয়ালদের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে পাহারাও কম দিতে হয় না ঘেটো, হনসো আর শালুকফুলকে। তবে পাহারাদার হিসাবে রাজহাঁসদের জুড়ি নেই। অ্যালসেশিয়ান কুকুরেরাও হার মানে তাদের কাছে। তাদের চোখ এড়িয়ে দুনিয়ার কোনও চোরেরই মনিবের বাড়ির ছায়ার কাছেও আসা সম্ভব নয়।

শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগছিল। ছুটি মানে, পুরোপুরিই ছুটি। সব দৈনন্দিনতার থেকেই ছুটি। তপু ছুটিতে এইরকম কোনও জায়গাতে এলে খবরের কাগজ পড়ে না, অবশ্য পায়ও না, টিভিও দেখে না, যখন খুশি চান করে, যখন খুশি খায়, যখন খুশি ঘুমোয়। রোজ দাড়ি কামায় না। শহরের সব বাধ্যতামূলক অভ্যেসকে পুরোপুরি বর্জন করে তার ছুটির প্রতিটি মুহূর্তকে সে পুরোপুরি উপভোগ করে। তারিয়ে তারিয়ে।

গত রাতে জোজোমামার হলুদ বাড়ির গেট অবধি গিয়েও সে ভিতরে ঢোকেনি। তার সাড়া পেয়ে জোজোমামার বাড়ির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা কয়েকবার ডেকে উঠেছিল কিন্তু যেহেতু গেট খোলেনি ও তাই থেমেও গেছিল। তপু আবার সেই চাল-ধোওয়া সন্ধেতে গাছেদের আর পাতাদের আর ফুলেদের গায়ের গন্ধের মধ্যে ভাসতে ভাসতে ধীর পায়ে বড়মামার বাড়ির দিকে ফিরে গেছিল। বড়মামার বাড়ির নাম 'ছুটি'। দারুণ পছন্দ নামটি তপুর।

ওর মধ্যের রসায়নে কী ঘটে গেছে ও ঠিক বুঝতে পারছে না কিন্তু 'দ্য রিট্রিট'-এর গেট অবধি এসেও ফিরে যাওয়ার কারণ কি শালুকফুল ?

'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' কথাটা শুনেছিল ছেলেবেলা থেকে কিন্তু শালুকফুলকে দেখার পর থেকেই ও বুঝতে পেরেছে যে কথাটা মিথ্যে নয়। অমন বোকা বোকা ব্যাপার এই একবিংশ শতাব্দীতেও ঘটতে যে পারে তা ওর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। খয়েরি রঙা একটি কটকি শাড়ি, খয়েরি রঙা ব্লাউজ পরা, তেল মাখা চুলে দু-বিনুনি করা উজ্জ্বল দীপশিখার মতো এই শ্যামবর্ণা আদিবাসী মেয়েটিকে দেখা মাত্র তপু নিজের বুকের মধ্যে ধুকপুকানি বোধ করতে শুরু করেছে। মামিমার সঙ্গে ওর সহজ সরল সপ্রতিভ ব্যবহার এবং মামিমারও ওর প্রতি মমতাময় ব্যবহার ও যে এই পরিবারেরই মেয়ে নয় তা বুঝতে দেয়নি।

মামিমা বলেছিলেন, দাদাবাবুর ঘরটা ভাল করে পরিস্কার করেছিস তো ? তোষক বালিস সব রোদে দিয়েছিলি ? পাশ বালিস ? কম্বল ?

হ্যাঁ গো মা। তুমি নিজে একবার চলো না দেখবে। তোমার কলকাতার ভাগ্নের একটুও অযত্ন করব না আমি। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

বড়মামিমার একটা রঙিন টিভি আছে কিন্তু এখানে কেবল চ্যানেল নেই। শুধুই দূরদর্শন পাওয়া যায়। তপু যখন জোজোমামার বাড়িতে যাবে বলে রওয়ানা হয়েছিল তখন সাতটার খবর পড়ছিল ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। শালুকফুল টিভির সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খবর দেখছিল ও শুনছিল। বড়মামিমাও এসে বসলেন সোফাতে। বড়মামিমা বলছিলেন, ওর টিভির পোকা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি যখন দেখি তখনই ও দেখে। ওর আসল ভালবাসা বইয়ের প্রতি। তারপর বললেন, টিভির নেশা হনসোর। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও সে ভল্যুম কমিয়ে টিভির সামনে বসে থাকবে। সিরিয়াল দেখবে। শালুকফুল রাতে লাইব্রেরি ঘরে অনেকক্ষণ থাকে। দেরি করে শুলেও খুবই ভোরে ওঠে। কাজে কোনও গাফিলতি নেই। ওই তো আমার ডান হাত। মেয়েটা খুব ইনটেলিজেন্টও। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি পড়তে ও লিখতে শিখে গেছে। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সও। ওই তো এখন আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট। হিসাবপত্র সব ওইই রাখে। বাগানের ইজারাদার্দেরও ওই সামলায়। তাছাড়া, লেখাপড়াতে জেনুইন ইন্টারেস্ট আছে। তোর বড়মামার লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে দেখিস -- নতুন বই তো খুব কমই কিনি আমি কিন্তু পুরনো বইগুলোই কী যত্ন করে যে ও রাখে তা বলার নয়। এবং নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ে। এখন এমন বই যে আমিও কোনওদিন পড়িনি। তোর বড়মামার তো নানা দিকে ইন্টারেস্ট ছিল ! যে নিজে বই ভাল না বাসে তার পক্ষে অমন করে বইয়ের যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, বই-এর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বাংলা ইংরেজি সব বই-ই পড়তে শুরু করে দেয়। যেদিন ও লাইব্রেরি ঘরে ঢোকে সেদিন নাওয়া-খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না ওর।

তারপর বলেছিলেন, ওকে একটা বাংলা আর একটা ইংরেজি ডিকশনারি কিনে দিয়েছি। কোনও বই পড়তে পড়তে ইংরেজি বা বাংলা যে শব্দের মানে না বোঝে তা একটা কাগজে লিখে রাখে তারপর রাতে সব কাজ শেষ করে সেই সব শব্দের মানেগুলো পাশে পাশে লিখে রাখে। না, এটা ঠিক, ওর শেখার, জানার, খুবই ইচ্ছা আছে। এখনকার কারিকুলাম-এর তো আমি খোঁজ রাখি না তবে মনে হয় ও সহজেই ক্লাস এইট-নাইনে ভর্তি হতে পারে। তবে ফর্মাল এডুকেশনের দরকারই বা কি ? আজকাল স্কুল-কলেজে যা অশ্বডিম্ব পড়ানো হয়। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলেরও বিদ্যের বহর দেখে ভিরমি খেতে হয়। শিক্ষকতা এখন আর কোনও ব্রত নয়, একটা পেশামাত্র।

চা এনেছি।

বলে, ঘরে ঢুকল শালুকফুল। তারপর বিছানার পাশের সাইড টেবল এর উপরে চায়ের ট্রেটা নামিয়ে রাখল। লিকার, দুধ, চিনি আলাদা আলাদা পটে -- পেয়ালা-পিরিচ-চামচ -- একটি প্লেটে দুটি চকোলেট ক্রিম বিস্কিট এবং দুটি ক্রিম ক্র্যাকার।

বড়মামা অত্যন্ত সৌখিন মানুষ ছিলেন। ইংলিশ ওয়েজউড-এর ক্রকারি। ক্রকারির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গত রাতের খাওয়ার সময়েও লক্ষকরেছিলাম।

চা বানিয়ে দেব ?

বলল, শালুকফুল।

না, আমিই বানিয়ে দেব। আমি পাতলা লিকার খাই, কম দুধ এবং এক চামচ চিনি।

ঠিক আছে। কাল আমি বানিয়ে দেখাব মনোমতো হল কী না ! আপনার বুঝি কোনও কিছুই মনোমতো না হলে চলে না ?

প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠলাম আমি। সাধারণত কোনও কাজের মেয়ে এভাবে কথা বলে না। বুঝলাম যে বড়মামিমারও সংসারে শালুকফুল নেহাতই একজন কাজের মেয়ে নয়, সে এ বাড়িরই একজন এবং সেই অধিকার বড়মামিমা ওকে হয়তো আধখানাই দিয়েছেন আর বাকি আধখানার অধিকার ও ওর আন্তরিকতাতে ও ভালোবাসাতে এবং সম্ভ্রান্ততাতেও আদায় করে নিয়েছে।

আমি চায়ের কাপে দুধ ঢালতে ঢালতে চুপ করে রইলাম।

শালুকফুল বলল, কই তপুদা, আমার কথার জবাব দিলেন না তো।

আমি বললাম, ঠিকই ধরেছ তুমি। আমার কোনও কিছুই মনোমতো না হলে চলে না।

মা জিজ্ঞেস করলেন, ব্রেকফাস্টে আপনি কি খাবেন ?

লক্ষকরলাম যে নাস্তা না বলে ও ব্রেকফাস্ট বলল।

বললাম, যা খাওয়াবে তাই খাব।

আমি যা খাওয়াব তাই খাবেন ?

বলেই, নিজেই এক অনামা ও অকারণ অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে গেলাম। ওকে 'তাই-ই' বলার সময়ে আমার চোখ দুটি ওর সুগঠিত দুটি স্তনের উপরে ছিল। শুধু কি স্তনই ? তার মরালী গ্রীবা ক্ষীণ কটি, তার গলার শিউলিফুলের মালা, কানের শিউলিফুলের দুল সব মিলিয়ে এই ঘরের মধ্যে এক আশ্চর্য আবহ তৈরি হয়েছিল আর তাকে দীপিত করেছিল শরৎকালের রোদ আর বাগানের পাখিদের ডাক। আমার ঘোর লেগে গেছিল। আমি নষ্ট, ভ্রষ্ট হয়ে গেছিলাম মুহূর্তের জন্যে। তীক্ষ্ম বুদ্ধিমতী শালুকফুলের চোখ আমার চোখের অসভ্যতা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিল। মুখে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটিয়ে সে যেন আমার অসভ্য চাউনিকে দেখেইনি এমন ভাব করে বলল, আপনাকে কিছু খাওয়াতে পারি এমন ভাগ্য কি আমার হবে ? ভাগ্যও নেই, সাহসও নেই।

একটি উনিশ-কুড়ি বছরের আপাত-অশিক্ষিত আদিবাসি মেয়ের মুখে এমন কথা শুনব তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওকি শরৎবাবুর বইও পড়েছে নাকি ? হয়তো পড়েছে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎবাবু, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ি ইত্যাদিদের সব বই তো ছিলই বড়মামার লাইব্রেরিতে।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

ও বলল, আপনি তো চান করার পরই ব্রেকফাস্ট খাবেন ? নাকি আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তারপর চানে যাবেন ? মা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।

বড়মামিমা কোথায় ?

মা পুজোর ঘরে। বেরোতে বেরোতে সাড়ে আটটা।

বড়মামি বেরোন পুজো সেরে। ততক্ষণ আমি একটু আয়েশ করে শুয়ে থাকি। তোমাদের এই চড়াইডিহ জায়গাটি আমার ভারি পছন্দের।

আর জায়গাটার মানুষগুলোকে ?

আমি উত্তর দিলাম না সে প্রশ্নের।

শালুকফুল বলল, জায়গাটার আর কতটুকু দেখেছেন। বিছানাতেই যদি শুয়ে থাকবেন তবে দেখবেনই বা কী করে।

দেখব খন। অঢেল সময় আছে। তাছাড়া, একটু দেখেই পুরোর আন্দাজ করা যায়। সবাই পারে না, আমি পারি।

আপনি কি আলসেমি করতে খুব ভাল বাসেন ?

কখনও কখনও।

ভাবলাম ওকে যদি বলতে যাই বার্ট্রান্ড রাসেল-এর 'ইন প্রেইজ অফ আইডেলনেস'-এর কথা, তাহলে তা তো ও বুঝবে না। মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। তাই চুপ করেই রইলাম।

যা ভাল বুঝবেন আপনি। শালুকফুল বলল, হাসি মুখে। ওর মুখে সবসময়ই একটি স্মিত হাসি ফুটে থাকে জলের মধ্যে ফুটে থাকা শালুকফুলের মুখের হাসিরই মতো।

এ জায়গা কি তুমি আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে ?

-- দেখাতে পারি। যদি মা দেখাতে বলেন আর আপনি দেখতে চান। জোজোবাবুর বাড়িতে তো পুপু দিদি এসেছেন। আমারই মতো বয়স। তবে ফটফট করে বড় বেশি ইংরেজি বলেন আর খুবই সুন্দরী। তাঁর সঙ্গেই কি যাবেন ?

-- তাঁরা তো মোটে এলেনই দুদিন হল। তুমি তাকে দেখলে কী করে !

-- বাবাঃ মোটরে করে এসেছেন যে কলকাতা থেকে। যে কদিন থাকবেন মোটরটিও থাকবে এখানে। সঙ্গে ড্রাইভারও এসেছে এবং একজন বেয়ারা। ওদের বাড়িতেই তো গেছিলাম কাল সন্ধেবেলা। মাকে না বলেই। ফিরে এসে খুব বকুনি খেয়েছি।

কী দেখে এলে ?

পুপু দিদিকে। ছোট প্যান্ট পরা অত বড় মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। কী সুন্দর ফর্সা পা দুখানি। আর তেমনই সুন্দর মুখ। তবে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বললেন না -- এমন একটা ভাব করলেন যেন আমি মানুষই নই। তবে জোজোমামা খুব ভাল। ওঁকে তো চিনিই। পুপু দিদিকে চিনতাম না বলেই আলাপ করার আগ্রহ ছিল।

মনে হলো, জোজোমামার মেয়ে পুপু বারমুডাজ পরেছিল। শালুকফুল তো কখনও বারমুডাজ দেখেনি। তাই ছোট প্যান্ট-এর কথা বলছিল।

আমি বললাম, সুন্দর পা আর সুন্দর মুখ দিয়ে আমি কী করব। আমি তো তাকে চুমু খেতে যাচ্ছি না আর তার লাথি খেতেও যাচ্ছি না।

শালুকফুল আমার কথা শুনে হেসে উঠল।

বলল, ভারী মজা করে কথা বলেন তো আপনি।

আমি বললাম, যে এখানের সব কিছু চেনে, গেলে তার সঙ্গেই যাব। বসন্ত দাদা, ঘেটো দাদা অথবা তুমি যে কেউ হলেই আমার কাজ চলে যাবে। তবে চান করে উঠে ব্রেকফাস্ট করে জোজোমামার বাড়ি যাব আগে। জোজোমামা আমাকে খুবই স্নেহ করেন। তবে কলকাতায় তো যোগাযোগ থাকে না। ওঁর স্ত্রী যে মারা গেছেন তাও তো জানা ছিল না আমার। তখন তো আমি বম্বেতে ছিলাম। এখনও বম্বেতেই আছি।

-- তাই ? বলিউডে গেছিলেন ?

বিরক্ত স্বরে আমি বললাম, না। বলিউড হলিউড নিয়ে নাচানাচি করি না আমি। আমি তো কলেজের ছাত্র নই যে হিরো-হিরোইনদের খবর রাখব ?

তুমি কী করো তপুদাদা ?

সমুদ্রের তলায় যে তেল থাকে, গ্যাস থাকে, সেই সব খুঁড়ে বের করি। পাড় থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে থাকি আমরা। অনেক সময়ে মাসের পর মাস থাকি -- অন্যসময়ে অল্পদিন।

-- কী করে যাও সেখানে ?

-- ছোট ছোট জাহাজ আছে। তাড়া থাকলে হেলিকপ্টারেও যাতায়াত করি।

-- এখানে তো কখনও আসেনি হেলিকপ্টার। তবে ছবি দেখেছি আর টিভিতে দেখেছি। নেতারা ধবধবে পোশাক পরে বন্যার সময়ে, খরার সময়ে, ভূমিকম্পের সময়ে তা থেকে নেমে বলেন, 'ভাহিও ঔর ব্যহনো'। আরও নানা ভাল ভাল কথা বলে।

তারপরই বলল, জানো, আমাদের চড়াইডিহর উপর দিয়ে রোজই সকাল দশটা পঁয়ত্রিশে আর বিকেল পাঁচটা দশ-এ প্লেন উড়ে যায়।

-- কোথায় যায় ?

-- তা কী করে বলব। একটা যায় সকালে পুব থেকে পশ্চিমে আর বিকেলেরটা যায় পশ্চিম থেকে পুবে। বম্বে তো পশ্চিমে, না ? তোমার মালিক কে ? আমার মালিক যেমন মা। তোমার কোম্পানির নাম কি ?

-- আমার কোম্পানি কোনও ব্যবসাদার নয়। দেশের কোম্পানি। নাম, ও এন জি সি। আর সে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হচ্ছেন সুবীর রাহা। দেখতেও বাঘের মতো, কাজেও বাঘের মতো। খুব সৎ অফিসার। আমাদের এই চোরেদের দেশে এমন অফিসার বেশি নেই। ভগবানের ভয়ে যদি কর্মচারীরা সৎ না হয় তবে রাহা সাহেবের নামে সৎ হতেই হয়।

-- তাই ? তা তোমার মালিক কোথায় থাকেন ? তিনিও কি সমুদ্রের মধ্যে থাকেন ?

না। তিনি দিল্লিতে থাকেন, দেরাদুনেও যান। প্রয়োজনে সমুদ্রের বুকেও আসেন।

অয়েল-রিগ বলে তোমাদের কাজের জায়গাকে, তাই না ? কিছুদিন আগে একটা জাহাজ ঢেউয়ের দোলা সামলাতে না পেরে কোনও অয়েল-রিগ-এ ধাক্কা মারাতে আগুন লেগে গিয়ে অনেক লোক মারা গেছিল না ?

-- আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি জানলে কী করে ?

-- টিভি দেখে। আবার কী করে।

-- তারপর বলল, মা টিভি দেখার জন্যে কেবলই বকে কিন্তু টিভি দেখে কত কী জানা যায়, তাই না ? আমি কি শুধু সিনেমাই দেখি ? আসল তো হল খবর। মা তো বলে আমি নাকি হচ্ছি খবরের কাগজ। সব খবর নাকি আমার কাছেই থাকে। মা খবর-টবর বেশি দেখে না। দেখে মোটামুটি আমিই মাকে বলে দিই। তবে সিনেমার পোকা হনসো দিদি। আমি কুচিৎ-কদাচিৎ দেখি। বই পড়তেই আমি বেশি ভালবাসি।

বাঃ তুমি তো দেখছি খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে শালুকফুল ?

-- বুদ্ধি দিয়ে কী লাভ হল। এ জন্মে তো আর বিএ এমএ পাশও করতে পারব না আর তোমার মতো চাকরিও করতে পারব না। মা, হনসোদিদি আর ঘেটোদাদার সঙ্গে এই চড়াইডিহর 'ছুটি'তেই সারাটা জীবন পড়ে থেকে ছুটি হয়ে যাবে শেষে। লেখা-পড়া শেখা হল না বলে পুপুদিদির মতো ছোট প্যান্টও পরা হবে না। লেখাপড়া শেখাটা খুব দরকার। লেখাপড়া না জানলে, অন্য মানুষে মানুষ বলেই গণ্য করে না।

-- তোমার সারাটা জীবন কতখানি লম্বা ?

তা কী করে বলব। শেষের কথা শেষই জানে।

-- লেখাপড়া তো তুমি নিজের চেষ্টাতেই শিখেছ। স্কুল-কলেজে না গিয়েও মানুষ খুব বড় মানুষ হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তো স্কুল-কলেজে যাননি। তাঁর মতো শিক্ষিত মানুষ কজন জন্মেছেন এই দেশে ? আমি কলকাতা ফিরে তোমার জন্যে অনেক বই পাঠিয়ে দেব। যার শেখার এত আগ্রহ সে ঠিকই শিখবে। তুমিও বড় হবে, দেখো। বেশি পড়লেই হয় না, যেটুকু পড়েছ সেটুকুকে হজম করতে হবে। পড়ে বদহজম হলে সে পড়া কোনও কাজে লাগে না। তেমন পড়ুয়ারা পন্ডিত নয়।

-- তবে পন্ডিত কারা ?

আমি হেসে বললাম, রবীন্দ্রনাথ বলতেন যাঁহারা সমস্তই পন্ড করেন তাঁহারাই পন্ডিত।

-- শালুকফুল হেসে উঠল এ কথা শুনে শিশুর মতো সারল্যে।

বলল, তাই বলতেন বুঝি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

-- তারপরই বলল, আমি 'শেষের কবিতা' পড়েছি, গোরা পড়েছি, নৌকাডুবি পড়েছি।

পড়েছ তো। কী বুঝেছ ?

-- আমি আমার মতো করে বুঝেছি। আমার বুদ্ধি তো বেশি নয়। তোমার মতো বুদ্ধি থাকলে আরও অনেক ভাল করে বুঝতে পারতাম।

একদিন তোমার আমার চেয়েও বেশি বুদ্ধি হবে।

শালুকফুলের দুটি চোখে হঠাৎ জল এল। মুখ নামিয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না তপুদাদা। কত কষ্ট করে ঝি-গিরি করতে করতে যেটুকু শেখার শিখেছি -- মায়েরই দয়াতে - মাই-ই হাতে ধরে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছেন। এগারো বছরে বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু করলে আর কতদূর এগোনো যায়, বলো ?

-- তুমি কখন আরম্ভ করছ সেটা বড় কথা নয়।

তারপর বলল, উইনস্টন চার্চিলের নাম শুনেছ ?

-- না তো।

উনি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জার্মানির হিটলার যখন সারা পৃথিবীতে আতঙ্কর সৃষ্টি করেন ...

বলেই থেমে গিয়ে বললাম, জার্মানি ও ইংল্যান্ড এই সব দেশের নাম জানো ? কোথায় এসব দেশ ?

বাঃ। ইংল্যান্ড তো ইংরেজদের দেশ। যারা আমাদের এত বছর পরাধীন করে রাখল তাদের নাম জানব না ? আর জার্মানির নামও জানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো জার্মানির সঙ্গেই হয়েছিল। তারপর জাপানের সঙ্গে। পার্ল হারবারে জার্মানরা বোমা ফেলার পর আমেরিকাও সেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

বাঃ বাঃ। তুমি তাও জানো ?

খুবই অবাক হয়ে বললাম আমি।

তারপর বললাম, এত সব কোথা থেকে জানলে ? কোন বই পড়ে ?

এ সব বই পড়ে জানিনি। মা রোজ আমাকে গল্প বলেন। নানা বিষয়ের গল্প। মায়ের মুখেই শুনেছি এসব।

বড়মামিমার উচিত বাড়িতে একটা স্কুল খোলা।

স্কুল না খুললেও আপনার বড়মামার নামে চড়াইডিহতে প্রাইমারি স্কুল আছে সেখানে তো প্রতি সপ্তাহে একটি দু-ঘন্টার ক্লাস নেন মা। সেই ক্লাসে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মা-বাবারাও এসে হাজির হন। মা যেটা করেন সেটা মস্ত কাজ। মা সকলের মধ্যে জানার ইচ্ছাটা জাগিয়ে দেন -- ছোট-বড় সকলের মধ্যেই। নানা গল্প বলেন ক্লাসে। মা আমাকে বলেন, আর ক-বছর পরে তোকে ওই স্কুলের দিদিমনি করে দেব। আমি বলি, আমি নিজেই কোনদিন স্কুলে গেলাম না আমি দিদিমনি হলে পড়ুয়ারা মানবে কেন আমাকে ?

চা খাওয়া শেষ করে আমি বিছানাতে উঠে বসলাম। পায়ের উপরে কম্বলটা মেলে দিয়ে। রোদটা তখন ঘরের আধখানাতে ছড়িয়ে গেছে। শালুকফুল দরজার একটা পাল্লাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল একটু বেঁকে। আমি বললাম, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? বোসো না। এতক্ষণ ওর কথা শুনে এবং ওর সঙ্গে কথা বলে বেশ বুঝতে পারছি যে শালুকফুল এ বাড়ির দাসী নয়, মেয়ে, বড়মামিমা তাকে নিজের মেয়ের মতোই যত্নে ও ভালবাসায় নিজে হাতে গড়ে তুলেছেন। ওর জীবনের প্রথম দিকের কটা বছর নষ্ট হয়েছে হয়তো কিন্তু পরের কটি বছর পুষিয়ে দিয়েছেন বড়মামিমা। শালুকফুলের কথা তো বড়মামিমা আমাকে কিছু জানানি, জানালে এই ফুলটিকে দেখতেই আমি চলে আসতাম চড়াইডিহতে। এই পাহাড়ি জায়গার বনজঙ্গলের মধ্যে অযত্ন-বর্ধিত এই অভাবনীয় গৃহপালিত জীবটি বড়মামিমার যাদু-স্পর্শে একটি ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার মতো ফুটে আছে তার পরিবেশ আলো করে।

তাকে বসতে বলাতে শালুকফুল হেসে বলল, ঠিক আছি। আপনার সামনে বসার যোগ্যতা আমি এখনও অর্জন করিনি। যেদিন করব, সেদিনই বসব।

তারপরই বলল, আপনি উইনস্টন চার্চিলের কথা বলছিলেন, কই ? আর কিছু বললেন না তো।

বললাম, উইনস্টন চার্চিলের 'ওয়ার মেমোয়ার্স' তোমাকে দেব আমি। তিন খণ্ড। ওরকম ইংরেজি খুব কম মানুষই লিখেছেন আজ অবধি। যদিও উনি সাহিত্যিক ছিলেন না।

ওয়ার মেমোয়ার্স লাইব্রেরিতে আছে। নেড়েচেরে দেখেওছি। কিন্তু ওই বই পড়ার মতো ইংরেজি জ্ঞান হতে এখনও অনেক সময় লাগবে, কোনওদিনও হবে কী না জানি না। আসলে, আপনার মতো মানুষতো কাছে পাই না। পড়ে আর কতটুকু শেখা যায় ? মা বলেন, জীবন থেকে শিখবি, মানুষের সঙ্গে মিশে শিখবি, চিতায় ওঠার আগের মুহূর্ত অবধি শিখবি। শেখার ইচ্ছাটা যেন কখনও মরে না যায়।

শালুকফুল বলল, তপুদাদা, আপনি বলছিলেন, চার্চিলের কথা, উইনস্টন চার্চিলের কথা ...

-- ও হ্যাঁ। তোমার এই পরিচয়টা তো আমার অজানা ছিল। ওই ব্যাপারটার অভিঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

-- অভিঘাত মানে কি ? আর কিসের পরিচয় ?

-- এই রে। বিপদে ফেললে তো। অভিঘাত মানে, সম্ভবত Impact।

-- বাংলা প্রতিশব্দ নেই ?

-- নিশ্চয়ই থাকবে। তোমার অভিধানে যদি না পাও তাহলে কলকাতা ফিরে আমি লিখে জানাব।

আর পরিচয়টা মানে ?

মানে তুমি যে এমন শিক্ষিত, তোমার যে এত বিষয়ে জ্ঞান আছে, তার চেয়েও বড় তোমার যে জানার ইচ্ছা আছে তা তো আমি জানতাম না।

আগে জানবেন কী করে। আগে তো আপনি আমাকেই জানতেন না।

তা অবশ্য ঠিক।

এবার চার্চিলে ফিরুন। মায়ের পুজো শেষ হয়ে এসেছে। ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত না করে আমি এখনও আপনার সঙ্গে গল্প করছি জানলে আমার কপালে দুঃখ আছে।

হ্যাঁ। উইনস্টনের পড়াশোনা বিশেষ হল না যখন তখন অতি অল্প বয়সে উনি ক্যাভালরি রেজিমেন্টে, মানে ঘোড়সওয়ারি হয়ে আর্মিতে যোগ দিলেন। তাঁকে ভারতে পাঠান হল। বাঙ্গালোরে পোস্টেড ছিলেন তখন। পোলো খেলেন আর জুয়া খেলেন রাতে। বয়স সতেরো হবে। উইনস্টনের চেহারা তুমি তখন যদি দেখতে। সরু কোমর, চওড়া বুক, রাজপুত্রই যেন। আমরা তো মোটাসোটা ডাবল-চিনের চার্চিলকেই জানি। পাহাড়ের মতো বপু।

ওঁর মা কিন্তু ছেলের উপরে আশা ছাড়েননি। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য,

দর্শন নানা বিষয়ের বই পাঠাতেন গাদা গাদা, উইনস্টনকে। মায়ের পাঠানো বইগুলি উইনস্টন পড়াশোনা। এমনইভাবে আমাদের শালুকফুলেরই মতো, এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও মতো, স্কুলে বা কলেজে না গিয়েই বাড়িতে পড়াশোনা করতে করতেই হঠাৎ একদিন ওঁর মনে হল যে, জীবনের এতগুলো বছর উনি নষ্ট করেছেন। যা নষ্ট করেছেন তো করেছেনই। এবারে গড়ে তোলার শুরু করতে হবে, জীবনে একজন মানুষের মতো মানুষ হতে হবে।

তখন সম্ভবত ওঁর বয়স তেইশ-চৈইশ হবে। ওঁর আত্মজীবনী 'মাই আর্লি লাইফ'-এ পরে উনি লিখেছিলেন 'দিস মাই অ্যাডভাইস টু ওল দি ইয়াং মেন অ্যান্ড উইমেন বিটউইন দি এজেস অফ সেভেনটিন টু টুয়েন্টি থ্রি ঃ রোল আপ ইওর স্লিভস এবং মেক ইওর ডেস্টিনি।' তাই তোমাকেও আমি বলছি যে, দেরি কিছুই হয়নি। যদি তেইশ বছরে শুরু করে কেউ উইনস্টন চার্চিল হতে পারেন তবে তুমিও একজন কেউ-কেটা হতে পারবে শালুকফুল। এই জীবনেই। এক জীবনেই।

তারপর বললাম, হিটলার যখন ব্রিটিশ এয়ারফোর্সকে মুছে ফেলার জন্যে ঝাঁক ঝাঁক প্লেন পাঠালেন এবং রয়াল এয়ার ফোর্স-এর সামান্য সংখ্যক প্লেন এবং মুষ্টিমেয় পাইলটেরা দেশকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপনে লড়ে এবং বীরের মতো মরে তাদের প্রতিহত করল তারপর দিন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উইনস্টন চার্চিল শোকস্তব্ধ এম পি-দের বললেন, 'নেভার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড সো মেনি, হ্যাড ওওড সো মাচ, টু সো ফিউ।' মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ পাইলটদের 'ব্যাটল অফ ব্রিটেইন'-এ জার্মান বিমান-বাহিনীকে দুঃসাহসিক লড়াই লড়ে হারিয়ে দেওয়ার জন্যেই উনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। কী সোজা ইংরেজিতে কী অসাধারণ বাক্যবন্ধ। ভাষার জোর একেই বলে।

শালুকফুল বলল, সত্যি।

তারপর বলল, আপনি কত্ত জানেন। আপনি এখানেই থেকে যান না তপুদাদা। মায়ের এতবড় বাড়ি এত জমিজমা, মায়ের এই স্কুল এসবের দেখাশোনা করার তো কেউই নেই। সমুদ্রের মধ্যের আস্তানাতে বাস করে তেল আর গ্যাস তোলবার কি দরকার ? মাটিতে থাকুন -- ছয় ঋতুর সৌন্দর্য উপভোগ করুন -- এখানের হতভাগা মানুষদের পাশে থাকুন -- আর আমরা তো আছিই আপনার সেবা করবার জন্যে। দিনই না আমাদের একটু সুযোগ। মা তাহলে কত যে খুশি হবেন।

-- জানি তা।

বললাম, আমি।

তারপর বললাম, অন্যকে সুখী করতে কার না ভাল লাগে বলো ? তবে কলকাতাতে যে আমারও মা আর বাবা থাকেন। তাঁদেরও যে আমিই একমাত্র সন্তান। তাছাড়া, কলকাতা শহরটা একটা আজগর সাপের মতো। তাতে একবার ঢুকে গেলে যতক্ষণ না সে নিজে তোমাকে উগরে দিচ্ছে ততক্ষণ তোমার বেরিয়ে আসার কোনও উপায়ই নেই।

আমার সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়ে শালুকফুল বলল, তাদেরও নিয়ে আসুন। সকলে মিলে সহজেই থাকা যাবে। এ বাড়িতে সাতটা শোবার ঘর উপর-নীচ মিলিয়ে। জায়গারও তো অভাব নেই। কোনও কিছুরই অভাব নেই। আপনার মাকে এবং বাবাকে বুঝিয়ে বলুনই না। বাবা তো রিটায়ার করেছেন ?

না। সেটাও একটা অসুবিধে। এখনও সাত-আট বছর বাকি।

তারপরে আমি শালুকফুলের উড়ন্ত উৎসাহের ডানা ছেঁটে দিয়ে বললাম, হবে, হবে। সব সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করতে যাওয়াটা মূর্খামি। বুঝেছো শালুকফুল।

শালুকফুল তবুও বলল, ভি আর এস নিতে বলুন না তপুদাদা।

বাবাঃ তুমি VRS-ও জানো।

টিভি দেখলে সব জানা যায়।

ঝলমলে শারদ সকালে ওই বনময় পরিবেশের মধ্যে 'দ্য রিট্রিট'-এর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথের দুপাশের ঝোঁপে-ঝাড়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে নানা ছোট ছোট পাখি ওড়াউড়ি করছিল। পাখিদের নাম জানি না। জানলে ভাল হত। অধিকাংশ বাঙালি লোকেরাই চিরদিন শিখে এসেছেন 'কী এক নাম না জানা পাখি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল'। দু-একজন লেখক ছাড়া গাছ বা পাখির নাম কেউই জানেন না। লেখকেরাই যদি না জানেন তবে আমার মতো সাধারণ মানুষেরা জানবে কী করে !

যখন 'দ্যা রিট্রিট'-এ বা 'হলুদ বাড়ি'তে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখলাম জোজোমামা বাগানে গাছগাছালির পরিচর্যা করছেন এবং বারান্দাতে ফেডেড জিনস

আর বাসন্তি রঙা টপ পরে বেতের চেয়ারে বসে একটি ইংরেজি বই পড়ছে একটি সুন্দরী মেয়ে। তাকে দেখতেও বিদেশীনিরই মতো। মামিমা মানে জোজোমামার স্ত্রী তো ইংরেজই ছিলেন। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু শাড়ি পড়তেন। পরিস্কার বাংলা বলতে পারতেন এবং বাংলা বইও পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। জোজোমামার শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীতেও একটি বাড়ি আছে। তবে আজকাল কম যান, বড়মামির কাছে শুনেছি। উনি নাকি বলেন, শান্তিনিকেতন আর সেই শান্তিনিকেতন নেই, কলকাতা বড় বেশি প্রভাব ফেলেছে তার উপরে। কলকাতার সব বড়লোক পেশাদার ও ব্যবসাদার গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছেন সেখানে। নির্জনতা নেই।

মেয়েটির বয়স হবে শালুকফুলেরই মতো। তার পাশের চেয়ারে একটি ওই বয়সী ছেলে একটি ময়ূরকণ্ঠী রঙা বারমুডাজ পরে হাতে একটি ইংরেজি বই নিয়ে বসে আছে। কিন্তু পড়ছে না। সম্ভবত এই শরৎকালের প্রকৃতি তার উপরে অমোঘ প্রভাব ফেলেছে। বই হাতে করেও সে পড়তে ভুলে গেছে।

জোজোমামা আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরে ! তপু যে। কবে এলে ?

গতকাল সকালে।

ট্রেনে এলে ?

হ্যাঁ।

তারপর স্টেশন থেকে কিসে এলে ?

গরুর গাড়িতে।

বাঃ।

তারপর বললেন, আমাদের স্টেশনটির নামটি ভারী ভাল। তাই না ?

ভালই তো। ফুলকুঁড়ি যে কোনও রেলস্টেশনের নাম হতে পারে তা ভাবাই যায় না।

সত্যিই তাই।

তুমি কি প্রতি বছরই আসো ?

ইচ্ছে তো করে। কিন্তু প্রতি বছর আসা হয় কোথায় ?

-- মা-বাবার কি খবর ? এখানে আসার আগে ফোন করেছিলাম। তোমাদের কাজের লোকটি বলল, ওঁরা দেশের বাইরে গেছেন।

-- হ্যাঁ। কুয়ালালামপুর গেছেন। মালয়েশিয়ান এয়ারওয়েজ দারুন প্যাকেজ দিচ্ছে। মালয়েশিয়া দেখা ছিল না তাই দেখতে গেছেন।

-- ভালই তো।ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন। তা, তুমি গেলে না কেন ?

-- আমি পরে এসেছি। তাছাড়া পাঁচ বছর পরে এখানে এলাম। বড়মামি একলা থাকেন। বড়মামা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। শেষবার এসেছিলাম তো পাঁচ বছর আগে।

মনে আছে। সেবারেই তো তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। আলাপ নয়, বলব বন্ধুত্ব। আলাপ তো ছিল তুমি যখন স্কুলে পড়তে তখন থেকেই। তুমি তো সেইন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়তে, তাই না ? আমার ভাগ্নে তিতাসের সঙ্গে।

-- হ্যাঁ। আমি আর তিতাস। সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজেও পড়তাম একই সঙ্গে। খুব ভাল ক্রিকেট খেলত ও। কলেজ টিমের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল। তারপর ও তো আর্মিতে চলে গেল। আর কোনও যোগাযোগ নেই।

আমার সঙ্গে আছে। এখন পুণেতে আছে। একটি মারাঠি মেয়েকে বিয়ে করেছে।

এবারে আমার মেয়ে পুপু এসেছে। আর সঙ্গে তার বয়ফ্রেন্ড আকাশ। চলো, আলাপ করিয়ে দি। ওরাও 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন' সেই পথ সদা বরণীয় জ্ঞানে স্টেটসে চলে যাচ্ছে। কবিতাটি কি ভুল বললাম ? সেই

ছেলেবেলাতে পড়া।

-- আমি জানিই না।

-- সত্যি ! তোমরা দিশি কিছুরই খোঁজ রাখো না। গ্লোবাইলাইজেশন একেবারে আমাদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। সচ্ছল বাঙালিরা আর বাঙালি নেই। সব সাহেব হয়ে গেল। চোখের সামনে দেশটা কেমন বদলে গেল। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা, মানে আমাদের জেনারেশনের মানুষেরা এবারে চলে গেলেই ভাল। তোমার মামিমার তো ছুটি হয়ে গেছে। ছেলে ও মেয়ে কেউই মায়ের কাজে আসতেই পারল না। তিতাস কিন্তু এসেছিল পুনে থেকে।

খবর পেলে আমিও আসতাম বম্বে থেকে। তবে আমি তো মাঝসমুদ্রে থাকি। খবরটা পেয়েছিলাম শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে।

তুমি তো ও এন জি সি-তে আছো, তাই না ? সুবীর রাহা আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল স্কুলে। ও তো তখন আমাদের গর্ব।

তারপর বললেন, আমার বড় মেয়ে আর ছেলে দেশেই আর ফিরবে বলে মনে হয় না। পুপুও তো চলে যাচ্ছে। এদের সকলেরই এমন একটা অ্যাটিটুড যে বিদেশে না গেলে জীবনটাই যেন বৃথা হল। অথচ আমাদের দেশটা কী সুন্দর !

তারপর বাগান থেকে পাথওয়েতে উঠে বললেন, চলো, তোমার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিই।

-- পুপু, জোজোমামার ছোট্ট মেয়ে, চেয়ার ছেড়ে ছেড়ে উঠে বলল, হাই।

তার বয়ফ্রেন্ড আকাশ চোপড়াও বলল, হাই। নাইস মিটিং উ।

জোজোমামা পুপুকে বললেন, তোরা বসে বসে বই না পড়ে তপুর সঙ্গে যা না, চিরাইডোংরিতে ঘুরে আয়, ভাল লাগবে। আজ তো পঞ্চমী। আজই তো চড়াইডিহর পুজোর বোধন হবে। কাল থেকে ঢাকের শব্দ শোনা যাবে। কলকাতাতে আর ঢাকের বাদ্যি শোনাই যায় না --। এখানে একচালার প্রতিমা। হেহেপুরার বড় কুমোর তিনমাস ধরে ভক্তিভরে মূর্তি গড়ে। এখানে এলে মনে হয়, সময় এখনও থেমে আছে। সময় দৌড়চ্ছে না। চারদিকের এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আমার এখানে এলে ভারি ভাল লাগে। একটা আনওয়াইন্ডিং এফেক্ট হয়। পাখির ডাক আর বনের গন্ধে নার্ভগুলো সব স্মুথড হয়ে যায়। আমি এখানে বসে ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'লিভস অফ গ্রাস' পড়ি, হেনরি ডেভিড থোরোর 'ওয়ালডেন' বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', রবার্ট ফ্রস্ট-এর কবিতা। আর রবীন্দ্রনাথ তো পড়িই। রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদের গান শুনি। আমার পুনর্জম হয়। নিজেকে 'নবীকৃত' না কী বলে আধুনিক বাংলা ভাষাতে, তাই করি। আসলে, বুঝলে তপু, মাটির কাছাকাছি না থাকলে, মানুষ বোধহয় অমানুষ হয়ে যায়। আমার স্ত্রী কেটি এ কথা বার বার বলত।

মামিমার নাম কেতকী ছিল না ?

সে নামতো আমি দিয়েছিলাম। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা কেতকী বলেই ডাকত, শুধু আমিই ডাকতাম কেটি বলে।

আমি চুপ করে রইলাম।

পুপু বলল, বাবা তুমি এখনও প্রি-হিস্টরিক রয়ে গেলে। তোমার মেন্টাল ফ্রেম-এ ডাইনোসোররের গায়ের গন্ধ আছে। মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে যচ্ছে তুমি তখনও তোমার টিকলিগড়, চিরাইডোংরি পাহাড় আর চড়াইডিহর দুর্গা পুজো নিয়ে পড়ে আছ। তবে উ হ্যাভ এভরি রাইট টু পারস্যু ইওর ওওন আইডিয়াজ, ইওর ওওন ওয়ে অফ লাইফ কিন্তু তা বলে আমাদের উপরে তোমার মতামত তুমি জোর করে চাপিয়ে দিতে পারো না। লিভ অ্যাড লেট লিভ।

আকাশ, বাংলা বোঝে না কিন্তু এটুকু বোধহয় বুঝল যে মেয়ের সঙ্গে বাবার কোনও বিষয়ে মতানৈক্য ঘটেছে। সে চুপ করে পুপুর মুখে চেয়ে রইল।

জোজোমামা আমার সামনেই যে পুপু তাঁকে নস্যাৎ করল তা দেখে একটু অপ্রতিভ হলেন। বললেন, আমি তো তোদের যেতে বাধ্য করছি না। সাজেস্ট

করেছিলাম মাত্র।

আমার মনে হল পুপু আর তার বন্ধু আকাশ আমার এই না বলে-কয়ে হুট করে আসাটা বিশেষ পছন্দ করেনি। তাদের প্রাইভেসি বিঘ্নিত হয়েছে। আমি একটু অপমানিত বোধ করলাম। বললাম, আমি যাই এখন জোজোমামা। বড়মামিমা আপানার কথা বলছিলেন। আপনি যদি পারেন তাহলে বিকেলে আসবেন একবার 'ছুটি'-তে। বড়মামি খুব খুশি হবেন।

জোজোমামা বললেন, তাই হবে। তবে তার আগে চিরাইডোংরি যাব। আমি তোমাকে বিকেল চারটেতে গাড়ি পাঠাব। তুমি এলে, আমিও গাড়িতে বসে চিরাইডোংরির দিকে যাব। পুরোটা তো গাড়ি যাবে না। যতখানি যায়, ততখানি গিয়ে বাকিটা আমরা হেঁটে যাব। নেটো বলছিল, চিরাইডোংরির জঙ্গল এখনও সেরকমই আছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে সানসেট পয়েন্ট-এ গিয়ে সেখান থেকে পাঁচ বছর আগে তোমার সঙ্গে যেমন দেখেছিলাম, তেমন সানসেট দেখব। বৌদিকে বোলো যে রাতে আমি তোমাদের ওখানেই খেয়ে আসব।

বললাম, ওঁরা যাবেন না ? সকলেই তো খাবেন ? আমরা 'ছুটি'তে পৌঁছে গাড়ি পাঠিয়ে দেব ওঁদের জন্যে না হয়, যদি ওঁরা হাঁটতে না চান।

না, না, তার দরকার নেই। ওরা একটু একাই থাকতে চায়। তাছাড়া, বৌদির সঙ্গে ওদের কম্যুনিকেট করতেও অসুবিধা হবে হয়তো। ওরা হাঁটাহাঁটি পছন্দ করে না এই ধুলোর মধ্যে। কলকাতাতে ফিরে 'জীম'-এ গিয়ে এক্সারসাইজের অভাবটা পুরিয়ে নেবে। লেট দেম এনজয় ইন দেয়ার ওওন ওয়ে।

যা বলবেন।

আমি বললাম।

তুমি এখুনি চলে যাবে ? চলো না, আমরা পেছনের বারান্দাতে গিয়ে বসি একটু। কফি বা চা খেয়ে যাও এক কাপ। ককটেইল সসেজ খাবে ? ওরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ভাল পিগারির সসেজ। বিয়ারও খেতে পারো, যদি ইচ্ছে করো।

-- কখনও সখনও বিয়ার যে খাই না তা না, তবে ইটস টু আর্লি ইন দ্যা ডে। বরং কফি খেতে পারি এক কাপ।

পেছনের বারান্দায় চলে গেলাম আমরা। পুপু ও আকাশ কোনও উচ্চবাচ্য করল না। আমাদের সঙ্গে যাওয়ার উৎসাহও দেখাল না, আপত্তিও জানাল না। ওদের এই ইনডিফারেন্সটা আমাকে আহত করল। ঠিক করলাম, আর আসব না এখানে।

পেছনের বারান্দাতে বেতের চেয়ারে বসে জোজোমামা বললেন, তাহলে কয়েক বোতল বিয়ার নিয়ে যাও তুমি। ফ্রিজে রেখে দিও। আছো তো এখানে কিছুদিন ? গাড়িতে তুলে দিচ্ছি। অনেক বিয়ার নিয়ে এসেছি আমি। একটু পরই শুরু করবে ওরা ওদের বিয়ার সেশন।

না, না, তার দরকার নেই জোজোমামা। বিয়ার না খেলেও আমার আনন্দর কিছু ঘাটতি হবে না।

রাতে আমি হুইস্কি নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বৌদি জানেন যে আমি খাই। আমি আর হারীতদা তোমার মামাবাড়ির পেছনের বারান্দাতে বসে, সেখান থেকে চিরাইডোংরি পাহাড়টা আর ঝাঁটি জঙ্গল দেখা যায়, গল্প করতে করতে হুইস্কি খেতাম। চমৎকার কাটত আমাদের সন্ধেবেলা। বৌদিকে আমিই জোর করে জিন বানিয়ে দিতাম অ্যাঙ্গুস্টোরা বিটার্স দিয়ে -- পিংক জিন। তোমার মামিমা, মানে, আমার স্ত্রী কেটিও কম্পানি দিত। তোমার মামিমা চলে যওয়ার পরে হুইস্কির পরিমানটা অনেকই বেড়ে গেছে।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, বুঝলে তপু, জীবনটা একটা ভ্যাকুয়াম হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই মনে হয়, ছেলেমেয়ে আমাদের না হলেই ভাল হত। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে, তাদের ভবিষ্যতের চিন্তাতে আমার তো বটেই বিশেষ করে তোমার মামিমারও যে ভাবে নষ্ট হয়েছে, তা আমিই জানি। ভারতীয় হিসাবে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমাদের যেটুকু প্রত্যাশা ছিল তার কিছুমাত্রও পূরন হয়নি। তোমার মামিমা নিজে ইংরেজ হয়েও যত না ইংরেজিয়ানা ছিল তাঁর আমার ছেলেমেয়েরা তার চেয়েও যেন বেশি বিদেশীভাবাপন্ন হল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ের দোষ নেই কোনও জোজোমামা, আজকাল একেবারে পাতি পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এরকম। ভারতীয়ত্ব, বাঙালিয়ানা

এসব যেন ক্রমশ উবে যাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশনের এই সস্তা দিকটা আমাকেও অবাক করে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তো তিতাস আর আমিও পড়েছি কিন্তু আমাদের মানসিকতা তো অন্যরকম।

ওদের কারও কাছ থেকেই আর্থিক সাহায্য তো আমরা চাইনি। চেয়েছিলাম, একটু বিবেচনা, কনসার্ন, বয়স্ক আমাদের জন্য একটু সহমর্মিতা। তার কিছুমাত্রই পাইনি আমরা। তোমার মামিমা প্রায় একমাস নার্সিং হোমে ছিলেন। কেমো চলছিল। পুপু তখন দিল্লিতে মাস-কম্যুনিকেশন পড়ছিল। ওরা বলে ম্যাসকম। তার পরীক্ষা ছিল সামনেই। ফোন করলে বলত এখন গেলে আমার কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে বাবা। এখন যাওয়া অসম্ভব। ফোনে তো রোজই খবর নিচ্ছি। তাছাড়া, গিয়ে করবটা কি ? নার্সিং হোমে তো তুমি ডে অ্যান্ড নাইট স্পেশাল নার্সও রেখে দিয়েছ।

তোমার মামিমা চলে যাওয়ার পরে সে অবশ্য এসেছিল। ছেলে আর বড় মেয়ে স্টেটস থেকে সৎকারের জন্যে আসবে ভেবে তোমার মামিমার মৃতদেহ আমি তিনদিন মরচুয়ারিতে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কেউই আসতে পারল না। মেয়ে বাহামাতে গেছিল ছুটি কাটাতে জামাই ও তাদের দুই জমজ মেয়েকে নিয়ে আর ছেলের শাশুড়ি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়াতে ছেলে আসতে পারছে না বলে জানিয়েছিল। পুপুই তার মায়ের মুখাগ্নি করেছিল। বড় মেয়ে ও ছেলে জানিয়েছিল মাকে যখন দেখতে পেলাম না তখন আর কাজের সময়ে গিয়ে কী করব ! একগাদা আত্মীয়স্বজনের কাছে এক্সপ্লানেশন দিতে দিতে অ্যানয়েড হয়ে যাব। পয়েন্টলেস হবে যাওয়াটা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, গৌড়িয় মঠে শ্রাদ্ধ করেছিলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমি নাজেহাল। নিজের সন্তানদের সকলে খারাপ বললে কারই বা ভাল লাগে বল ? নিজে যেদিন বাবা হবে সেদিন এ কথার যাথার্থ্য বুঝবে।

তারপর কফি এলে, কফি খেতে খেতে বললেন, 'মানুষ' হওয় বলতে তুমি কি বোঝো তপু ? আমার সব সন্তানই ব্রিলিয়ান্ট। তারা দারুন মেধাবী। কৃতী। ছেলের নাম তো নোবেল-এর জন্যে কনসিডারড হচ্ছে। হয়তো পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ ? তোমার চলে যাওয়া মামিমারই বা কি লাভ ? তপু, তুমি তখন তোমার মামিমার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমাকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলে অয়েল-রিগ থেকে। চমৎকার বাংলা লেখো তুমি, রবীন্দ্রনাথের কিছু কথার উদ্ধৃতিও দিয়েছিলে সেই চিঠিতে। সেই চিঠিটি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। চিঠিটি এসেছিল শ্রাদ্ধর মাসখানেক পরে।

তারপর বললেন, ভারী গলাতে, ভিজে চোখে, তোমার মতো আমার একটি ভারতীয় ছেলে থাকলে আমি গর্বিত হতাম। আমার বাঁচার ইচ্ছে আর নেই। পিস্তলের এক গুলিতে নিজেকে শেষ করে দিতে পারতাম সহজেই। তাতে ছেলেমেয়েরাই অপদস্থ হতো। 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়', এ কথা লিখে গেলেও বুঝতো যা বোঝার। তাই হুইস্কি খাই অপরিমিত। শুধু হুইস্কিই নয়। বুঝতে পারছি যে আমি অ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। ন্যাচারাল ডেথ হলে তো ছেলেমেয়ের গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।

তারপর আমাকে হতবাক করে দিয়ে বললেন, তুমি কি আমার মুখে আগুন দেবে তপু ? আসতে পারবে বম্বে থেকে ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, কি যে বলেন আপনি জোজোমামা। এ কথা বলবেন না। প্লিজ। চলুন, বিকেলে আমরা চিরাইডোংরিতে যাব সেই সেবারে যেমন গিয়েছিলাম।

চড়াইডিহর পুজোতে অষ্টমীর দিনে আরতিও দেখব কিন্তু। আর দুপুরে খিচুড়ি খাব, পুজোর প্রসাদ। সেবারেরই মতো।

জোজোমামা বললেন।

ওঁরা যাবে না ? মানে, আপনার ছোট মেয়ে আর তার বন্ধু আকাশ ?

মনে হয় না যাবে। পুপু একটা রাসকেলকে বিয়ে করছে। ওর সম্বন্ধে আমি দিল্লির বন্ধুবান্ধবদের কাছে থেকে খোঁজ নিয়েছি। আকাশ ওর বাবার একমাত্র ছেলে। ওর বাবাও তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে। তিনি, মানে, আকাশের ঠাকুর্দা রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা করে অনেকই পয়সা করেছিলেন। খুশওয়ান্ত সিং-এর বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি কাজের মানুষ ছিলেন। আকাশের বাবা বিনোদ চোপড়া একটা স্কাউন্ড্রেল। সারাদিন দিল্লি গল্ফ ক্লাবের বার-এ পড়ে থাকে আর জুয়া খেলে। সেই জুয়ার স্টেক-এর কথা শুনলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওয়েল-অফফ্ হওয়াটা দোষের নয় কিন্তু ওয়েল অফফ্ বলেই যে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে হবে তার কোনও মানে নেই। দারিদ্র ও বিফলতা মানুষকে অনেকই সময়েই ফ্রাস্টেট করে নিঃসন্দেহে কিন্তু স্বাচ্ছল্য ও সাফল্যও অনেক সময়েই একইভাবে করে। বিনোদ চোপড়া এই রকমই একটা কেস। ছেলেটা পড়াশুনোতে ভাল -- সেটা হয়তো জিন-এর জন্যে হয়েছে -- কিন্তু ভীষণই খারাপ আপব্রিঙ্গিং। তাছাড়া বিনোদের

ওয়াইফ ইজ আ লেডি অফ ইজি ভার্চু। দিল্লির হাই সোসাইটির সকলেই এ কথা জানেন। তবে একটু চুপ করে থেকে জোজোমামা বললেন, আমার এসব বলা মানায় না কারণ আমারতো ধারণা আমি আর কেটি আমাদের ছেলেমেয়েকেও অত্যন্ত ভাল শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে হলটা কি ? এই যদি এদের মতিগতি হয়, রুচি হয়, ভ্যালুজ হয় তবে অন্যকে খারাপ বলাটা তো আমার উচিত নয় আদৌ।

কফিটা খাওয়া হয়ে গেলে বললাম, আমি এখন উঠি জোজোমামা। বিকেলে দেখা হবে। আপনি গাড়ি পাঠাবেন না। আমার এখানে এসে হাঁটতে খুব ভাল লাগে। আমি এখানে হেঁটেই চলে আসব। এখান থেকে আপনার সঙ্গে না হয় গাড়িতেই যাব।

জোজোমামা আমাকে ছুটি-র গেট অবধি পৌঁছে দিলেন। পুপু আর আকাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাই। নাইস মিটিং উ।

আমিও বললাম, বাই।

আমার তো ওদের বিশেষ খারাপ মনে হল না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এরকমই হয়। অনেকে একটু অন্তর্মুখীও হয়। কষ্ট করে বাইরের মানুষকে মানিয়ে নিতে পারে না, বিশেষ করে যারা গভীর হয় তারা তো একেবারেই পারে না। ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা -- ওরা যদি একটু একা ও আলগা থাকতে চায়, তাতে দোষের কি ? আমার মনে হল জোজোমামা একটু ওভার রিঅ্যাক্ট করছেন। হয়তো মামিমার মৃত্যুর পরে ওঁর মনের ভারসাম্যর গোলমাল হয়েছে নইলে আমি তাঁর যতই প্রিয় হই না কেন, পাঁচ বছর পরে দেখা হওয়া বন্ধুর বোনপোকে নিজের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগ করাটা আমার স্বাভাবিক বলে মনে হল না।

পথে পড়ে ভারি ভাল লাগছিল। কতদিন যে গান গাই না। চান ঘরেও গাই না। গান গাইতে হলে মনের এক বিশেষ অবস্থা লাগে -- কেয়ার-ফ্রি অবস্থা। মাথার মধ্যে সবসময়েই কিছু না কিছু চিন্তা থাকেই অথচ সেই সব চিন্তা না করলেও চলত।

জোজোমামা পেছন থেকে ডেকে বললেন, তপু তুমি বিয়ে করোনি এখনও ?

আমি মাথা নাড়লাম।

তোমার তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখনও করলে না কেন ?

হেসে বললাম, করা হয়নি, এই আর কী।

সে কি ? তোমার মতো এলিজিবল ব্যাচেলর ? হোয়াটস দ্যা প্রবলেম ? কলকাতাতে ফিরে তোমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলব।

আমি কিছু না বলে সামনে পা বাড়ালাম। ভাবছিলাম, হোয়াট ইজ জোজোমামাজ প্রবলেম ? আমি তো বেশ আছি। বিয়ে করে জোজোমামা যে সব সমস্যাতে পড়েছেন তা উপলব্ধি করার পরও আমার বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন ? শুধু আমি একাই বা কেন ? একটা সময় আসছে পৃথিবীতে যখন অনেক পুরুষ ও নারীই বিয়ে করবে না। হয়তো আগামী কয়েক বছর লিভ-টুগেদার করবে অনেকে -- তারপর আর তাও করবে না। মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এমনই তীব্র হয়ে উঠেছে আজকাল, যে লিভ টুগেদার করতেও যতটুকু স্বাধীনতা সমর্পন করতে হয় ততটুকুও আগামী দিনের মানুষে করতে চাইবে না। আমাদের দেশেও মেয়ের অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার পরে কোনও পুরুষের উপরে আর্থিকভাবে নির্ভর করার প্রয়োজন তাদের ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া, সময়মতো বিয়ে না করা হয়ে উঠলে বিয়ে করার সাহসেও হয়তো টান পড়ে। ভয় করে বিয়ে করতে। যাই হোক, এখনও যখন বিয়ে করার তেমন তীব্র তাগিদ বোধ করিনি আর করব বলে মনে হয় না। বম্বে এবং কলকাতাতে তিন-চারজন বন্ধু আছে, সমরুচির, সম-মানসিকতার, সামান্য উদবৃত্ত সময়টুকু তাদের সঙ্গে কাটাতেই ভাল লাগে। একসঙ্গে কখনও বেড়াতে যাই বাইরে, ভাল ছবি দেখি, ভাল রেস্তোরাঁতে খাই। শারীরিক আকর্ষণ কখনও কখনও যে বোধ করিনি তাদের কারও প্রতি তা নয়, তবে সেটা স্থায়ী হয়নি কখনও। তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত, ভাল পরিবারের এবং স্বনির্ভর।

কাল এখানে আসার পর থেকে শালুকফুলের প্রতি যে এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করছি ঠিক তেমনটি আমার কোনও বন্ধুর প্রতি আজ অবধি বোধ করিনি। সেটা কি কাম ? না কি পোষা, পরনির্ভর, বাধ্য ও সুন্দর পাখি বা বেড়ালনিকে মানুষ যেমন করে ভালবাসে তেমনই ভালবাসা এটা ? এই বোধটা যে কি ? তা আমি নিজেও জানি না। আমার মন বলছে, জোজোমামার দুঃখময় এবং একঘেয়ে স্বগতোক্তি শোনার চেয়ে, তাঁর সঙ্গে সময় কাটানোর চেয়ে, শালুকফুলের সঙ্গে সময় কাটানোটা আমার কাছে অনেকই সুখকর হবে -- বড়মামিমার কাছেও বেশিক্ষণ থাকা হবে।

'ছুটি'-র গেট-এ পৌঁছে হঠাৎই গানটা মনে এল। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতে পুজোর আগে গানটা শুনলে পড়াশুনো মাথায় উঠতো। মনে হতো, সমস্ত শরৎকালটাই বুঝি তার সব কাশফুল, পদ্মফুল আর শালুকফুলও নিয়ে তার সোনার আলো সারা অঙ্গে মেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। 'শরৎ আলোর কমলবনে/বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে/তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাত কিরণ মাঝে/হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে' ...

গান গাইতে গাইতে বারান্দাতে উঠলাম। শালুকফুল আমার রাতে জামা আর পায়জামা ধুয়ে মেলে দিচ্ছিল বাড়ির বাঁ পাশের বিস্তীর্ণ পেয়ারাতলিতে। একজোড়া দুগ্গা-টুনটুনি ডাকছিল। তাদের ডাকে এই শরতের উদাস বিধুর এগারোটার বেলা যেন একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো আমার দু-চোখের মনির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। সেই ছবির ফ্রেমের ঠিক মধ্যেখানে একটি হলুদ রঙা শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরা, পিঠের উপরে কোমরসমান ভেজা চুল ছড়ানো, দুর্দান্ত গড়নের শালুকফুল ফুটে রইল। সত্যি শালুকফুলে গন্ধ থাকে না কিন্তু এই শালুকফুলের ভেজা চুল থেকে সুগন্ধ উড়ছে।

আজকালকার অধিকাংশ মেয়েই চুল ছোট করে ফেলেছে -- তেল আর কেউই মাখে না, কেবল শ্যাম্পু। বড় চুল এবং শাড়ি নাকি কাজের পরিপন্থী। কে জানে! ইন্দিরা গান্ধী তো দেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব করে গেছেন জিনস বা সালোয়ার-কামিজ না পরেই। চুলটা অবশ্য কেটেছিলেন। তাঁর মুখের গড়নে সেটা মানিয়েও যেত। কিন্তু পদিপিসীর মতো মুখ নিয়ে যে সব মেয়ে চুল ছোট করেন তাঁদের যে কেমন দেখতে লাগে তা কি তাঁরা জানেন? এই সব কর্মবীরা মহিলাদের আমি দূর থেকে প্রণাম করি।

শালুকফুল আমাকে গান গাইতে শুনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। মিথ্যে বলব না, এ পর্যন্ত অনেক মেয়েই অনেকই সময়ে অনেক জায়গাতেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছে। আমি যেমন চেয়েছি অনেকের দিকে মুগ্ধতায় দ্রব হয়ে, কিন্তু তাদের মুগ্ধতার সঙ্গে শালুকফুলের অপাপবিদ্ধ মুগ্ধতার কোনও তুলনা হয় না।

বড়মামিমা বসার ঘর থেকে বারান্দাতে বেরিয়ে এসে বললেন, তপু এলি ? জোজো কি আসবে ?

হ্যাঁ বড়মামিমা। আসবেন, হুইস্কি খাবেন এবং রাতে এখানেই খেয়ে যাবেন।

আর ওর ছোট মেয়ে ? ঘেটো বলছিল, পুপু না কি নাম। সে ?

তার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছে। পাঞ্জাবি। ছেলে বন্ধু। হয়তো বিয়েও করবে পরে। তবে এখন দুজনেই স্টেটস-এ চলে যাচ্ছে। তবে ওরা আসবে না বোধহয়। মানে, আজ।

তবে তো ওদের জোড়ে ডেকে অগ্রিম ভাল করে খাইয়ে দিতে হয়। বিয়েই যখন হবে।

ওসবের মধ্যে যাবেন না বড়মামিমা। এসব প্রথা দেশ থেকে উঠে গেছে। বিয়ের পরেই কেউ খাওয়ায় না আজকাল। তার অগ্রিম খাওয়া। তাছাড়া, তারা একটু একা থাকতে চায় আর যা মনে হল, খুব একটা মিশুকেও নয়। আপনি ডাকলে আপনার অস্বস্তি হবে আর ওদের তো হবেই।

ঠিক আছে। আছে তো সাতদিন। জোজোকে জিজ্ঞেস করে পরে নেমন্তন্ন করব খন একদিন।

ওই পাখি দুটো কি দুগ্গা-টুনটুনি বড়মামিমা ?

হ্যাঁ। তুই নাম জানলি কী করে ?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে।

অ। আমি পাখিদের নাম-টাম জানি না। ও সব জানে শালুকফুল। তবে ও যা নাম বলবে তা তুই কোনও বইয়ে পাবি না। সে সব স্থানীয় নাম। লাইব্রেরিতে সালিম আলির বই আছে। বইটি বের করে পাখিদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সব নাম জেনে নে না।

আমি তো অর্নিথলোজিস্ট নই। এত জ্ঞানে আমার দরকার নেই। আমার শুধু ভাললাগাটুকু হলেই চলবে।

মামিমা তারপর বললেন, খাবি কখন ?

আপনি যখন খান।

আমি একটাতে খাই। ওয়ান ও ক্লক শার্প। তবে তুই যদি আগে বা পরে খাস তবে তোর সময়েই খাব। আফটার অল, তুই আমার অনার্ড গেস্ট।

না, না আমিও একটাতেই খাব। যে বাড়িতে যা নিয়ম। আমাদের কলকাতার বাড়িতে ছুটির দিনে আমাদের খেতে খেতে আড়াইটা হয়।

এখন কী করবি ?

পেছনের বারান্দাতে বসে চিরাইডোংরি পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকব আর ভাবব।

কী ভাববি ?

আবোল-তাবোল।

চা-কফি শরবৎ-টরবৎ কিছু খাবি তপু ? আধ-বোতল জিন আছে ফ্রিজে। মহীন এসেছিল গত মাসে। কেন যে এসেছিল কে জানে ! দিন-রাত শুধু জিন খেয়ে গেল লেবু দিয়ে। বাড়ি থেকে কোথাওই বেরলোই না। গাড়ি নিয়ে এসেছিল টাটা থেকে। তিনদিন পরে আবার গাড়িতে উঠে চলে গেল। কৃষ্ণার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে সেই শক-এ মহীন অ্যালকহলিক হয়ে গেছে। মনে হয়।

জোজো মামার অবস্থাও তো তেমনই দেখলাম। মামিমার মৃত্যুর পরে তিনিও অ্যালকহলিক হয়ে গেছেন। রাতে পেছনের বারান্দাতে বসে হুইস্কি খাবেন বললেন। বড়মামার সঙ্গে যেমন খেয়েছিলেন পাঁচবছর আগে।

আমার কাছে তো এসব নেই, থাকেও না।

না না, উনি নিজেই নিয়ে আসবেন। তোমার এখানে যে নেই তা তো উনি জানেনই। থাকার কথাও নয়।

তুই খাবার আগে জিন খাবি তো বল। শালুকফুল লেবু, বরফ সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে ট্রে-তে করে। তোর বড়মামা থাকতেই ওকে সব শিখিয়ে দিয়ে গেছেন নিজে হাতে করে।

আপনি কি খাবেন বড়মামিমা ?

না রে তপু। তোর বড়মামা থাকতে তার সঙ্গে একটু আধটু খেতাম। এখন ভাল লাগে না। তেমন ভাল অবশ্য কোনওদিনও লাগেনি।

খেতে যখন দেড় ঘন্টা বকি আছে এবং মহীনকাকার প্রসাদও যখন একটু আছে তখন খাইই একটু। বললাম, আমি।

বলেই বললাম, আমি পেছনের বারান্দাতে গিয়ে বসছি বড়মামিমা। আপনিও আসুন না। কাজ তো রোজই থাকবে। আমি তো রোজ থাকব না।

ঠিক আছে। তুই যা। আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে যাচ্ছি। এরা সব কিছুই করে কিন্তু ছড়ি না ঘোরালেই সব গোলমাল করে দেয়।

তারপরই বললেন, তুই নাকি উইনস্টন চার্চিলের কথা বলেছিলি সকালে শালুকফুলকে ? একটু আস্তে আস্তে এগো বাবা। বড় গুরুপাক হয়ে গেল না ! সে তো তোর পায়ের কাছে বসে তোকে গুরু করে এই কদিনে যা শেখার সব শিখে নেবে বলেছে। এখন তুই চলে গেলে মুশকিল হবে আমার।

কেন ?

কেন আবার কি ? যত নতুন শেখা জ্ঞান সব আমার উপরে ঝাড়বে।

শালুকফুল ধারেকাছে ছিল না। বড়মামিমা বললেন, ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট আর ওয়েল ম্যানার্ড মেয়ে। ওর মা-বাবা কেউই নেই। ওঁর দশ বছর বয়স থেকে ওকে আমি আর তোর বড়মামা আমাদের মনের মতো করে মানুষ করেছি। এখানে

থেকে তো ভাল স্কুলের এবং কলেজের সুযোগ পেল না কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। আমাদের প্রভাব ওর উপরে এতটাই পড়েছে যে ওর জন্যে পাত্র যোগাড় করাই মুশকিল হচ্ছে। অথচ বিয়ের বয়স তো অনেকদিনি হয়ে গেছে। তবে ওকে ছাড়তেও মন সায় দেয় না। বুঝলি না, মানুষমাত্রই স্বার্থপর। ও আমার নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি। নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বলেই ওর বিয়ের জন্যে তেমন চেষ্টাও করছি না। ওর সমাজে, ওর যোগ্য পাত্র পাওয়াও মুশকিল। আই এ এস, আই পি এস হলেই যে মানুষ হবে এমনতো নয়।

ওর দশ বছর বয়স থেকে আপনাদের কাছে রয়েছে তো কিন্তু আমি যখন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এসেছিলাম তখন তো ওকে দেখিনি।

দেখিসনি ?

না তো।

ও। ফুলকুঁড়ির লুথেরান মিশনের ফাদার টোপনো ওকে নিয়ে গেছিলেন পনেরো দিনের জন্যে। মিশনের স্কুলের মেয়েদের পড়ানোর জন্যে। বোঝ তাহলে, ১৭ বছর বয়সেই দিদিমনি হয়ে গেছিল ও কোনও স্কুল-কলেজের ফর্ম্যাল এডুকেশন ছাড়াই।

ওর বয়স কত ? এখন চব্বিশ। ওদের সমাজে তো ষোলো-সতেরোই বিয়ে হয়।

ওতো আর ওদের ওদের সমাজের নেই। ওতো আমাদের সমাজেরই হয়ে গেছে।

সে কথা ঠিক। সত্যি। সি ইজ একস্ট্রা-অর্ডিনারি উওম্যান। আমার চেয়ে যে বয়সে অনেকই ছোট নইলে আমিই ওকে বিয়ে করে নিয়ে যেতাম।

-- তোর মায়ের হার্ট-অ্যাটাক হত। তোর বাবাও তোকে ত্যাজ্যপুত্র করত।

-- আমি তো এমনিতেই ত্যাজ্য। নতুন করে ত্যাজ্য করার তো কিছু নেই।

-- তাহলে কর বিয়ে। বয়সের তফাৎটা কোনও ব্যাপার নয়। মনের যদি মিল হয় সেখানে শরীরের বয়সের অমিলটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের কত বছরের ডিফারেন্সে বিয়ে হত ? তাঁরা কি অসুখী ছিলেন ? আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী ছিলেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে শালুকফুলকে আসতে দেখা গেল বাগানের দিক থেকে। হলুদ শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে একগুচ্ছ হলুদ রাধাচূড়া ফুল গুঁজেছে উজ্জ্বল কালো চুলে। নামে তো ওর ফুল আছেই তবে সে ফুল তো সাদা। হলুদ শাড়ি আর হলুদ ফুলে আর কালো ব্লাউজে হলুদ বসন্ত পাখির মতো দেখাচ্ছে ওকে। 'হলুদ বসন্ত' উপন্যাসের শুরুতে সেই যে একটা কবিতা ছিল না ? 'সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে' -- কবিতাটি কার লেখা তা মনে নেই কিন্তু প্রথম যৌবনে 'হলুদ বসন্ত' আমাদের মনে মনে হলুদ আলো জ্বেলে দিয়েছিল। আজ হলুদবরণ শালুকফুলের মধ্যে ফেলে আসা প্রথম যৌবনের কলেজ-জীবনের হলুদ-রঙা সেই সব উজ্জ্বল প্রেমময় অবুঝ দিনগুলি যেন ফিরে এল।

বড়মামিমা শালুকফুলকে বললেন, ফ্রিজ থেকে মহীনকাকার সেই ফেলে যাওয়া আধ-খালি জিন-এর বোতল, বরফ আর লেবু ট্রেতে করে বারান্দাতে নিয়ে যেতে।

আমি গিয়ে বসলাম বারান্দাতে। 'ছুটি'র পেছনের বারান্দাতে বসে যে দৃশ্য দেখা যায় না তা তুলনাহীন। যাঁরা ইন্দোরের কাছের রূপমতী আর রাজবাহাদুরের মান্ডুতে গেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন রূপমতী মেহাল থেকে নিমারের আদিগন্ত জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার কথা বললে। রূপমতী মেহালের গা ঘেঁষে হঠাৎই পাহাড়টা সোজা নীচে নেমে গেছে খাড়া। কমপক্ষে দেড়-দু-হাজার ফিট। দুর্গ তো এমন দুর্গমই হওয়ার কথা। অথবা মনে করা যায় পালামৌর কুরু আর চান্দোয়া-টোড়ির মধ্যের আমঝারিয়া বাংলোর সামনের উপত্যকার কথা -- খাড়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জঙ্গলাবৃত আদিগন্ত যে উপত্যকা হাজারীবাগ অবধি চলে গেছে -- চিড়িয়াডিহর উপত্যকাও তেমনই। মুগ্ধ হয়ে বসেছিলাম আমি। ঘন নীল শরতের আকাশ। নীচে রৌদ্রস্নাত হরজাই জঙ্গলে মোড়া উপত্যকা। আকাশে পাহাড়ী বাজ উড়ছে আর উড়ছে শকুনেরা। এত উপরে উড়ছে তারা যে কালো কালো বিন্দুর মতো দেখাছে তাদের।

শালুকফুল ট্রেটা হাতে করে এসে বারান্দার সেন্টার টেবল-এর উপরে রাখল।

আমি বললাম, এই উপত্যকা শেষ হয়েছে কোথায় গিয়ে, তা জানো ?

আমি তো উপত্যকার শেষে যাই নি কখনও। তবে চড়াইডিহর বয়স্কদের কাছে শুনেছি যে এই উপত্যকা শেষ হয়েছে পানুয়ান্না টাঁড়ে গিয়ে। যেখানে হাতিরা তাদের বাচ্চা হওয়ার সময়ে গিয়ে পৌঁছয়। গভীর জঙ্গল আছে সেখানে। বিরাট বিরাট মহীরূহ, যাদের নিচে এমন ছায়া যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার। মেয়ে হাতিরা সেই সব গাছের ছায়াতে প্রসব করে। তখন ওদিকে কেউ গিয়ে পড়লে তার জীবন সংশয় হয়।

তাই ?

তাই-ই তো বলে গাঁয়ের বুড়োরা।

আমি গ্লাসে এক পেগ মতন জিন ঢেলে নিয়ে, জল লেবু আর বরফ মিশিয়ে বললাম, একবার যাবে ? আমি গেলে তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

কোথায় ?

পানুয়ান্না টাঁড়ে।

সে কতদূর তা কে জানে ? কতদিন পায়ে হেঁটে যেতে লাগবে তাই বা কে জানে !

আমি চুপ করে সেই উপত্যকার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, আধুনিক মানুষে পৃথিবীর তো বটেই, মহাকাশেরও সব রহস্য উন্মোচিত করছে একে একে। তার অজানা, তার অগম্য কিছুই নেই, কোনও জায়গাই আর নেই। তাই এই প্রেক্ষিতে এই ফুলকুঁড়ি স্টেশনে নেমে পাঁচ মাইল চড়াইতে চড়াইতে এই চিড়িয়াডিহতে এসে পৌঁছে এখান থেকে পানুয়ান্না টাঁড়ের দিকে চেয়ে একটি অন্তত রহস্যর খোংজ মিলল যা সবজান্তা মানুষের জ্ঞানে এখনও কলুষিত হয়নি। আধুনিক মানুষের জীবনে এই এক অভিশাপ। কোনও রহস্যই আর বেঁচে নেই। সব রহস্যকেই মানুষ নিজে হাতে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। জানা অবশ্যই ভাল, কিন্তু সব জানা ভাল কী না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মোহাবিষ্ট লাগছিল আমার। কে জানে ! ওই উপত্যকা ধরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে হেঁটে গেলে কত গাছ, কত পাখির দেখা পাওয়া যাবে, লোকচক্ষুর আড়ালে বয়ে যাওয়া কত না কুলকুলানি-তোলা ঝর্না পড়বে পথে। এই পৃথিবীটা বড় বেশি চেনা আর পুরনো হয়ে গেছে।

শালুকফুল বলল, তপুদাদা একটা গান শোনাবেন ?

আমি কি গায়ক ? কখনও সখনও চান ঘরেই গাই শুধু, কলতলার জল পড়ার শব্দের অনুষঙ্গে। আমার গান গান নয়।

শালুকফুল বলল, মা বলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'একাকী গায়কের নহে তো গান।' গান যে গায় সে গান তার যতখানি, যে বা যারা তা শোনে, তাদের তা অনেকই বেশি। আমি এতো গান ভালবাসি কিন্তু গান গাইতে পারি না। ভগবান সবাইকে সব দান দেননি। সকলকে সব দেন না তিনি। কিছু দেন তো তার চেয়ে অনেক বেশি অদেয় রাখেন।

বাঃ। ভারী সুন্দর করে কথা বলো তো তুমি শালুকফুল।

তুমি নিজে ভাল তাই সকলের মধ্যেই ভাল দেখো। এখন কথা থাক, একটা গান শোনাও।

শোনাতে হবেই ?

হ্যাঁ। হবেই।

আমি গাইলাম, ছেলেবেলাতে মায়ের মুখে শোনা সেই শরতের গানখানি। মা অর্গান বাজিয়ে গাইতেন। সন্ধ্যেবেলা চান করে উঠে পাটভাঙা তাঁতের শাড়ি পরে কটেজ অর্গানের সামনে বসে গান গাইতেন মা। বাবা গান ভালবাসতেন না। ছেলেবেলা থেকে গান আমার খুব প্রিয় ছিল তাই মা আমাকেই গান শোনাতেন। বাবা তাঁর লাইব্রেরি ঘরে ইজিচেয়ারে বসে হুইস্কি আর সিগার খেতে খেতে সে গান শুনতেন। শুনতেন বটে কিন্তু গানের সঙ্গে একাত্ম হতেন না। বাবার অনেকই গুণ ছিল কিন্তু এই গুণ থেকে, মানে গানের মধ্যে মজে যাওয়ার ক্ষমতা থেকে, বঞ্চিত ছিলেন।

শালুকফুল বলল, কী হল তপুদাদা, গাও না।

'আজি শরৎ তপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কী যে গায় গো"

আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায় --

কোন কুসুমের আশে কোন ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায় গো।

এমন সময়ে বড়মামিমা এসে আমার পাশের চেয়ারে বসে গলা মেলালেন। গাইতে গাইতেই হতেই আমি একটা গেলাসে ওঁকে একটু জিন সেজে দিলাম।

গান শেষ হলে বড়মামিমা বললেন, তুই তোর মামাবাড়ির এই গুণটা পেয়েছিস। গানের মতো জিনিস আছে? মনটা উদাস করে দিলিরে তপু। তোর মা-বাবা যেখানেই যান না কেন প্রতি বছর পুজোর সময়ে তুই চিড়িয়াডিহতেই আসিস। তোর বড়মামা চলে যাওয়ার পরে বড় একা লাগে। এই চিড়িয়াডিহর প্রাকৃতিক আবহে আমি এমনভাবেই জড়িয়ে গেছি যে কোনও শহরে আর যেতে ইচ্ছেই করে না। সেই সব শহরে বড় আওয়াজ, বড় পল্যুশন। ভাগ্যিস শালুকফুলটা ছিল। ও না থাকলে কী করে যে দিন কাটত। সংসারের কাজ আর বই পড়ে সময় আর কাটতে চায় না। একা একা গান গাইতে ইচ্ছেও করে না। তুই গাইলি তাই কতদিন পরে যে গাইলাম আমিও তোর সঙ্গে।

শালুকফুল বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, আরও একটা গাও তপুদাদা। তাহলে তোমার সঙ্গে মাও গাইবে।

আমি কি সব গান জানি যে ওর সঙ্গে গাইব?

বড়মামিমা বললেন।

শালুকফুলের কাজল দেওয়া উজ্জ্বল দুটি স্পন্দিত চোখের তারার দিকে চেয়ে আমার সহকর্মী মাজিদের মুখে শোনা একটি উর্দু শায়েরী মনে এল ঃ 'অ্যাইসা ডুবাহুঁ তেরি আঁখোকি গেহরাই মে, হাত মে জাঁম হ্যায় মগর পীনেকি হোঁস নেহি।' অর্থাৎ তোমার চোখের গভীরে আমি এমনি করেই ডুবে গেছি যে হাতে আমার পান পাত্র ধরা আছে কিন্তু চুমুক দিতেই ভুলে গেছি।

মনে মনেই আবৃত্তি করলাম। মনের সব কথাকে বাইরে আনতে নেই।

শালুকফুল আবারও বলল, গাও না তপুদাদা। কী ভাল গাও তুমি।

বললাম, বড়মামিমা তোমাকে রবীন্দ্রনাথকেও গুলে খাইয়েছেন কিন্তু এ কথা কি বলেননি যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভাল জিনিস অল্প বলিয়াই ভাল।'

শালুকফুল বলল, না। বলেননি তো এই কথাটি।

বড়মামিমা হাসছিলেন। আমি দিগন্তলীন পানুয়ান্না টাঁড়ের দিকে চেয়ে গ্লাসে চুমুক দিলাম। বড় ভাল লাগছিল আমার। মহীনকাকার আধ-খালি জিন-এর বোতল আর

এই আবহ, বড়মামিমা আর শালুকফুলের সান্নিধ্য আমাকে পূর্ণ করে তুলছিল আস্তে আস্তে। তবে পূর্ণ কি কেউই হতে পারে ? সারা জীবন চেষ্টা করেও ? ভাবছিলাম আমি। টুকরো-টাকরা নিয়েই আমাদের সকলের জীবন -- জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পথ চলা -- পূর্ণতার কামনাতে ভর করে।

কথা না বলে আমি বারান্দাতে স্থির হয়ে বসেছিলাম। জোজোমামা, পুপু, আকাশ, মহীনকাকা, বড়মামিমা এবং শালুকফুল এবং তাঁদের সকলের সঙ্গে আমি জীবনের শোভাযাত্রাতে সামিল হয়েছি। কার পথ কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে ! কিন্তু এই অবিরত চলার আরেক নামই জীবন। যার যার সমস্যা সমাধান করতে হবে তাকেই -- একা একা -- যার যার আশা পূরিত করতে হবে নিজেকেই। কারও অঙ্ক মিলবে, কারও বা মিলবে না। জীবনের নানা আশীর্বাদ আর অভিশাপ সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে আমাদের প্রত্যেককে। আমাদের সবাকার জীবনই একটি শেষ না-হওয়া গল্প -- সকলের জীবনেই কোনও না কোনও দিগন্তলীন পানুয়ান্না টাঁড় থাকেই -- যে দিকপানে চোখ মেলেই আমাদের দিন-মাস-বছর এবং জীবন কাটানো।

হাওয়াটা পাতায় পাতায় মর্মরধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছিল। নানা গন্ধ উড়ছিল মন্থর বাতাসে। স্ফুট ও অস্ফুট নানান পাখির ডাক। এরই মধ্যে আমরা তিনজন নীরবে বসে ছিলাম দিগন্তলীন পানুয়ান্না টাঁড়ের দিকে চেয়ে।

www.murchona.com

Chodaidihor Shalukful by Buddhadeb Guha

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com